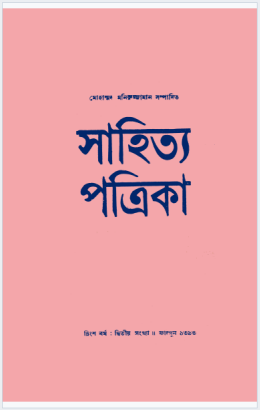

Vol. 30 | No. 2 | 1987

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সত্যেন সেনের সামাজিক উপন্যাস

Volume	30
Issue	2
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রফিকউল্লাহ খান
Published online	February 1, 1987
DOI	10.62328/sp.v30i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i2.5
Pages	67-128
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সত্যেন সেনের সামাজিক উপন্যাস

রফিকউল্লাহ খান

সময়, সমাজ, ইতিহাস ও সভ্যতার দ্বন্দ্বমুখর আন্তরক্রিয়ায় সংগঠিত হয় শিল্পীর জীবনবোধ ও শিল্পাদর্শ। শিল্পীর সৃজনীকল্পনার উদ্ভব ও ক্রমমাত্রার পটভূমিতেও গতি সঞ্চার করে জীবনের বিচিত্রমাত্রিক উত্তাপ-স্পন্দন। কারণ, বিশেষ কালের শিল্পপ্রকরণ সমকালীন জীবনের সমগ্রতাকে ধারণ করেই হয়ে ওঠে বিশিষ্ট, উত্তরণমুখী। সত্যেন সেনের (১৯০৭--১৯৮১)[১] উপন্যাস বিবেচনার ক্ষেত্রেও এ-সত্য প্রাসঙ্গিক উপন্যাসের বৈচিত্র্যময় পটভূমি এবং অগ্নিময় জীবনকল্পনা যেমন তাঁর অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যনির্দেশক প্রান্ত, তেমনি, সমকালীন জীবনের গতি, যন্ত্রণা, সংক্ষোভ ও উত্থান-পতনের অঙ্গীকারও তাঁর বিষয় ও আঙ্গিকচেতনার জীবন্ময় উৎস।

মানবীয় সম্ভাবনায় অপরিসীম আস্থা, সুস্থ-সচেতন জীবন-অভীপ্সা অধীত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতাকে শিল্পমণ্ডিত করার অপরিমেয় দক্ষতা এবং মার্কসবাদী চেতনালব্ধ বিশ্বদৃষ্টির সমন্বয়ে সত্যেন সেনের উপন্যাস বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের পটভূমিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে গৌরবান্বিত। একটা পরিণত জীবনাদর্শ ও দার্শনিক মীমাংসা তাঁর মধ্যে শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করেছিলো। ফলে, জীবনবোধের ব্যাপ্তি ও গভীরতায় তাঁর উপন্যাস একদিকে যেমন আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি ঐকান্তিক, অন্যদিকে তেমনি, আঙ্গিক-প্রকরণের প্রশ্নে কিছুটা অমনোযোগী। জীবনের প্রতি ইতিবাচক পক্ষপাতিত্বই যে সত্যেন সেনের শিল্পবিচ্যুতির অন্যতম কারণ, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু তাঁর স্রষ্টাচৈতন্য অবলোকনের জন্য এর চেয়ে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ হলো জীবনের সমস্ত অসঙ্গতি, বঞ্চনা, সংগ্রাম-সংঘাতের মধ্যেও একটা প্রজ্বল, আকাঙ্ক্ষাদীপ্ত শিল্পীমনের উপস্থিতি।

স্বতঃস্ফূর্ত কৈশোরক প্রেরণা বা তারুণ্যের সৃষ্টিপ্রিয় আবেগ থেকে উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেননি সত্যেন সেন। পরিণত বয়সে রাজনীতিচেতনায় মীমাংসিত অভিজ্ঞান নিয়েই উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি। যেখানে শিল্পের চেয়ে জীবন মুখ্য, যেখানে ব্যক্তির আবেগ, প্রণয়, সংরাগ অপেক্ষা সমাজ ও সংগ্রাম মুখ্য---সত্যেন সেনের উপন্যাস পাঠকের চেতনায় সে-জগৎকেই উন্মোচন করে। সে-কারণেই তাঁর উপন্যাসে জীবনচেতনার ক্রমরূপান্তর সন্ধান অবান্তর। তাঁর সৃষ্টি সে-ক্ষেত্রেই সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং সার্থক, যেখানে তিনি একীভূত করতে সক্ষম হয়েছেন জীবন ও শিল্পকে। যখন তিনি বক্তব্য ও উদ্দেশ্য সচেতন, তখনও দেখা যায়, একটা সম্ভাবনাময় শিল্পকর্মও বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের অভিঘাতে রক্তাক্ত। অবশ্য এই রক্তক্ষরণ জীবন-উদ্ভূত। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও পরিণামে তাঁর উপন্যাসে মুখ্য হয়ে থাকে সেই ব্যাপক ও গভীর জীবনবোধ---যা বিজ্ঞানমনস্ক ও বস্তুবাদী স্রষ্টা-মানসের জীবনচেতনায় উজ্জ্বল। বাংলা কথা সাহিত্যের পটভূমিতে সত্যেন সেনের স্বাতন্ত্র্য ও সাফল্যের সূত্র এখানেই নিহিত।

ব্যক্তিগত জীবনে বামপন্থী রাজনীতিসম্পৃক্তি সত্যেন সেনের চেতনায় যে মীমাংসিত ও অভিজ্ঞানমণ্ডিত জীবন ও শিল্পবোধ সঞ্চার করেছিলো, তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই এর অন্তরঙ্গ স্বাক্ষর বিদ্যমান। সুদীর্ঘ জীবনাভিজ্ঞতায় তিনি জাতীয় সমাজ ও রাজনীতির জটিল স্রোতধারাকে গভীরভাবে অবলোকন করেছিলেন। ফলে, তাঁর ইতিহাসসচেতন, বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক বিশ্বদৃষ্টি নিজস্ব জীবন ও শিল্প-অন্বেষার মতো উপন্যাসবিধৃত চরিত্র-পাত্রগুলোর মধ্যেও জীবন্ত অভিক্ষেপ সূচনা করেছে। তাঁর সুপরিব্যাপ্ত জীবন পরিসর এবং সাধনা ও লক্ষ্যের নতুনত্ব নিরূপণের প্রশ্নে জাতীয়-আন্তর্জাতিক সমাজ-রাজনীতির পশ্চাৎ-পটভূমি এবং অগ্নিময় সমকালের উন্মোচন প্রাসঙ্গিক।

বুর্জোয়া সভ্যতার গৌরবময় উত্থান ও তার অগ্রযাত্রার শিল্পরূপ হিসেবে যে উপন্যাসের স্বীকৃতি, সেই সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা, অবক্ষয় ও রক্তপাতের পটভূমিতে তার শিল্পরূপের ক্ষেত্রেও সঙ্কট দেখা দিতে বাধ্য। দু'টো বিশ্বযুদ্ধ কেবল পুঁজিবাদী সভ্যতার অন্তর্গত মৃত্যুযন্ত্রণার স্বরূপই উন্মোচন করলো না, তার শিল্পরূপকেও সম্মুখীন করলো নবতর

সঙ্কট ও অগ্নিপরীক্ষার।[২] পুঁজিবাদী যন্ত্রসভ্যতার শক্তিকেন্দ্রসমূহে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) প্রচুর অন্তর্গত-বহির্গত রক্তক্ষরণ সংঘটিত করলেও, উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তার আবেদন ছিলো ভিন্ন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অবক্ষয় শৃঙ্খলিত সমাজকাঠামোতে নবতর প্রত্যাশা ও উজ্জীবনের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করলো। যে-কারণে দেখা যায় বিশ্বযুদ্ধ পাশ্চাত্য উপন্যাসকে অসুস্থতা, শূন্যতা এবং উত্তরণহীনতার মধ্যে নিক্ষেপ করলেও[৩] উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত ভারত উপমহাদেশে তা অনেকটা আত্মস্থ হবার, সমাজ ও রাজনীতিচেতনার ক্ষেত্রে মীমাংসা সন্ধানের প্রেরণামন্ত্র হয়ে উঠলো। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাতীয় জীবনে যে ধ্বংসবীজ রোপণ করেছিলো, তার ফলাফল হয়েছিলো সুদূরপ্রসারী। ১৯৪১ থেকে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৩৫০/১৯৪৩)---প্রভৃতি মানুষের বস্তুগত ও ভাবজীবনের ওপর মর্মান্তিক প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধের ভয়াবহ বাস্তবতা অতিক্রম করলেও তার স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা সচেতনমানসে নবতর জীবনমন্ত্রের কার্যকারণ হয়ে উঠলো। বিধ্বস্ত সমাজকাঠামোর অন্তর্বর্তী জনজীবনের প্রত্যাশা প্রচলিত সামন্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ওপর আস্থা হারালো। তাদের চেতনায় এ-সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, সমাজের তথাকথিত নেতাদের উচ্চারিত সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ত্যাগ ও সংগ্রামের বাণী মূল্যহীন। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে প্রথাগত ধারণা সম্পর্কে সংশয় হয়ে ওঠলো তরুণমানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ-সময় মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা ও রাজনৈতিক মতাদর্শ তরুণ সমাজের অন্বিষ্ট হয়ে ওঠলো। মার্কসবাদী সাহিত্য সংগঠন 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' (১৯৩৯)--এর কার্যক্রমও এ-সময় শিল্পীর জীবনচৈতন্য ও শিল্পাদর্শকে অনেকাংশে আন্দোলিত করতে সক্ষম হয়। যে-কারণে, সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকেদের মধ্যে জীবনসম্পর্কিত একটা প্রত্যয়, রাজনীতিচেতনার ক্ষেত্রে একটা মীমাংসা নির্মাণের প্রয়াস হলো সুস্পষ্ট। ত্যাগের মহিমায় উদ্দীপিত অহিংস রাজনীতির কংগ্রেসীয় সক্রিয়তাও বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা---প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আন্তঃসারশূন্য বলে প্রমাণিত হলো। ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মরণ-যন্ত্রণা যে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার জন্ম দিলো, ভারতের পূর্বাঞ্চলের বিশেষ করে বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতিতে তার ফলাফল হলো দূরসঞ্চারী।

সত্যেন সেন এই সমাজ ও সময়ের অভিজ্ঞতাঋদ্ধ শিল্পীপুরুষ। ৪৭-এর বিভাগ-পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। সমাজের মৌল কাঠামোর পরিবর্তনহীনতার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কারাগার প্রকারান্তরে রূপান্তরিত হলো আরেকটা নবনির্মিত উপনিবেশের কারাগারে। প্রগতির পরিবর্তে সমাজে শুরু হলো অন্তর্গতি। নীতি, মূল্যবোধ ও জীবনচেতনার ক্ষেত্রে সামন্তবাদী ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিই স্বীকৃতি পেলো রাষ্ট্রীয় ভাবে। ফলে, প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলা দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে যে গতিতরঙ্গ সৃষ্টি করে, তার ইতিবাচক পরিণতির আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত পাকিস্তানী প্রশাসন প্রগতিশীল রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্মীদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করে; স্বাভাবিকভাবেই সত্যেন সেনও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অবশ্য সত্যেন সেনের জীবনে এই কারাভোগ নতুন ছিলো না, বৃটিশ শাসনামলেই তিনি একাধিকবার নিজের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সক্রিয় কার্যক্রমের জন্য কারাভোগ করেছেন।[৪] তবে বিভাগোত্তরকালেই তিনি সাহিত্যসাধনাকে নিজের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছিন্ন অংশে পরিণত করেন— যা বাংলাদেশের স্বতন্ত্র সাহিত্যযাত্রায় নতুন মাত্রা সংযোজনে সক্ষম হয়।

দুই

ষাটের দশকের আত্মবিবরকামী, সমাজ-সময় ও বহির্জগৎবিমুখ বাঙালি সৃষ্টিশীল মানসের জীবনচৈতন্যের পটভূমিতে সত্যেন সেনের স্বকাল, তার রাজনীতি, ইতিহাস, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের সমগ্রতায় উন্মুখর উপন্যাসলোক স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল। বাহান্ন সালের রক্তাক্ত উজ্জীবন আমাদের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যে স্বপ্নসম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছিলো, চেতনার সেই গতি ব্যাহত হয় ১৯৫৮ সালে আয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তনের ফলে। সামরিক শাসনের ভয়াল আগ্রাসন নবনির্মিত রাষ্ট্রকাঠামোর অন্তর্বর্তী জনজীবনকেই কেবল রক্তাক্ত করলো না, তার সচেতন শিল্পী মানসেও সঞ্চার করলো আত্মময়তা, পলায়নবাদী মনোভঙ্গি এবং বিবরবাসীর নিমজ্জমান রিরংসা। একটা

অনিশ্চিত আন্দোলনে-আর্তনাদে ক্ষতবিক্ষত ভূখণ্ডের শিল্পীমন জাগতিক আবর্তের জটিলতায় সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ব্যক্তির নিঃসঙ্গ পদচারণাকে মনে করলো যথার্থ; সেখানে সামসময়িক জীবন হলো বিসর্জিত----ব্যক্তির মনোজগতই হলো শিল্পীর একান্ত অন্বিষ্ট। অবশ্য ব্যতিক্রম যে একদম ছিলো না তা নয়। কিন্তু শৈল্পিক অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই ব্যর্থ হলেন বলা চলে। সত্যেন সেনের উপন্যাস রচনার সূচনা ও সিদ্ধি বলতে গেলে এ-সময়কালেই। যখন জাতীয় জীবন ও রাজনীতি একটা ভয়ানক পরিণতির দিকে ধাবমান, যখন সাহিত্য-শিল্প অন্বেষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক জীবনাদর্শ অবজ্ঞাত, তখন সত্যেন সেন তাঁর উপন্যাসে যে জীবন ও জগৎকে উন্মোচন করলেন, তা বিস্ময়কর বলেই মনে হয়। সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাস—এই ত্রিমাত্রিক অন্বেষা তাঁর উপন্যাসে এমন ভাবে একীভূত হয়ে গেছে যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি জীবনবোধের ঐকান্তিকতায় অভিন্ন আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে অভিব্যক্ত করেছেন।

বিষয়-অনুসারে সত্যেন সেনের উপন্যাসসমূহকে তিনটি পর্যায়ভুক্ত করা যায় :[৫]

এক. সামাজিক উপন্যাস
দুই. রাজনৈতিক উপন্যাস
তিন. ঐতিহাসিক উপন্যাস

এ-বিভাজন যে আপেক্ষিক, সত্যেন সেনের উপন্যাসে তার প্রচুর অন্তঃসাক্ষ্য বিদ্যমান। কেননা, জীবনবোধের যে ঐকান্তিকতার প্রসঙ্গ ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তার-ই অঙ্গীকার এই বিভাজনমাত্রার অন্তর্বর্তী ব্যবধানসীমাকে স্বাভাবিকভাবেই বিপন্ন করে তোলে। তাঁর নিতান্ত ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস যেমন সুনির্দিষ্ট কালবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে না, তেমনি, নিছক সামাজিক বিষয় সম্বলিত উপন্যাসেও দেখা যায় রাজনীতির অপ্রতিহত প্রাসঙ্গিকতা।

অগ্রসর সমাজ ও জীবনচৈতন্যের পটভূমিতে পরিণত রাজনৈতিক অভিজ্ঞান প্রযুক্ত করে তিনি উপন্যাসকে সমকালীন চারিত্র দানে সক্ষম হয়েছিলেন। যে-সময়ের 'আত্মভূক চেতনাশ্রয়ী; বিকৃত সমাজ-গঠনের চার

দেয়ালে শৃঙ্খলিত, সমাজ-শর্ত সাপেক্ষ, ব্যক্তি প্রতিক্রিয়াবাদী' চৈতন্য-সামগ্রী আমাদের উপন্যাসের গৌরব এবং দৌর্বল্যের স্মারক;----যখন 'জলস্তম্ভের মতো ঊর্ধ্বগামী কোন প্রতিভা শর্তমুক্ত সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে অবরুদ্ধ অবক্ষয়, অচলতাকে চাবুকাঘাত করে সচল করেনি। এমন কি ইতিহাসের আলোক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সমাজ-অন্তর্গত ক্রমবিকাশের ফল্গু-শক্তি-স্রোত সন্ধানে ছিল অনীহ'[৬] তখন সত্যেন সেন বিষয়ভাবনা ও জীবনচেতনার দিক থেকে ইতিবাচক পটভূমিকে উন্মোচন করলেন উপন্যাসে। বিষয়বৈচিত্র্যে তাঁর উপন্যাস যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি জীবনবোধের বস্তুনিষ্ঠ একাগ্রতায় সমকালীন জীবনচেতনারই শিল্পপ্রতিভাস।

যে-উপন্যাসসমূহে মুখ্য অর্থে সত্যেন সেনের সমাজজিজ্ঞাসার প্রতি-ফলন ঘটেছে, সেগুলোকেই সামাজিক উপন্যাস শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। যেমন: ১. রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ ২. পদচিহ্ন; ৩. সেয়ানা এবং ৪. একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে। জীবন-অবলোকনে যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী শিল্প-দৃষ্টি তাঁর রাজনীতি বা ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসসমূহে বিধৃত, তার সার্থক সমন্বয় না ঘটলেও সত্যেন সেনের জীবনাদর্শ ও শিল্প চেত-নার স্বরূপ নির্দেশে সামাজিক উপন্যাসগুলোর গুরুত্ব গৌণ নয়। যে-সমাজ সঙ্কটের পটভূমিতে রাজনৈতিক কর্মী সত্যেন সেন প্রায় পঞ্চাশোর্ধ বয়সে সাহিত্যসাধনাকে জীবনব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে নান্দনিক রুচি-অভীপ্সা অপেক্ষা জীবনবোধের মৌল সিদ্ধান্তের ভূমিকাই ছিলো মুখ্য। কারাগার থেকে শুরু করে গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জীবনসমগ্রতা, এমন কি, নীতি-আইনের দৃষ্টিতে অবজ্ঞাত-ঘৃণীত ব্যক্তির কর্মকাণ্ড পর্যন্ত যে-সমাজবাস্তবতার অনিবার্য সত্য, সেই সমাজকেই সত্যেন সেন গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে অবলোকন করেছেন। সামাজিক উত্থান-পতনের মধ্যে ব্যক্তিক ও সামূহিক অস্তিত্বের যে সঙ্কট, সেই সঙ্কট এবং তা থেকে উত্তরণের প্রয়াস-সাধনা উল্লিখিত উপন্যাসসমূহে সুস্পষ্ট।

তিন

সত্যেন সেনের জেলজীবনের অভিজ্ঞতাভিত্তিক উপন্যাস "রুদ্ধদ্বার মুক্ত-প্রাণ"।[৭] কারাগারের অন্তরালে সংঘটিত ঘটনাপুঞ্জ এ-উপন্যাসের উপজীব্য

হলেও একটা সুনির্দিষ্ট জীবনসত্য লেখকের বোধ ও উপলব্ধির কাছে ছিলো সমুজ্জ্বল। ঔপন্যাসিকের এ-সংক্রান্ত বোধ ও উপলব্ধির স্বাক্ষর-বাহী একটি প্রাসঙ্গিক উচ্চারণ উদ্ধৃতিযোগ্য: 'যাকে বলে কারাকাহিনী রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ তা' নয়। এর ঘটনা ও চরিত্রগুলি প্রায় সবই কল্পিত। তবু এর পিছনে একটা সত্য রয়ে গিয়েছে।'[৮] এই 'সত্য' প্রকৃতপক্ষে পর-স্পরিত দু'টো ধারাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। একটি হচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অপরটি পরিবেশ-আবেষ্টনী ও বৃহত্তর সমাজজীবনের অঙ্গীকারলব্ধ। উত্তম পুরুষে বর্ণিত কাহিনীর কথক একজন রাজবন্দী। উপন্যাসের সূচনা ও পরিণাম একজন রাজনৈতিক কর্মীর ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভব, আদর্শচিন্তা ও দ্বন্দ্বময় জীবনচৈতন্যনির্ভর হলেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের স্রোতস্বতীতে পারিপার্শ্বিক জীবনপ্রবাহ, তার ব্যক্তিক ও সামষ্টিক অস্তিত্বের অনিবার্য অভিঘাত একটা বৃহত্তর ব্যঞ্জনায় কল্লোলিত হয়ে উঠেছে। লেখক-উচ্চারিত 'সত্যে'র উৎসমূলে রয়েছে একজন রাজবন্দী অর্থাৎ লেখকের জীবনবাস্তবতা, এবং সেই ব্যক্তি-অস্তিত্বের পারিপার্শ্বিকতায় সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ। ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টির নিরাসক্তি কারাগারে অন্তরীণ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে তাদের স্ব স্ব অবস্থানে রেখেই পর্যবেক্ষণ করেছে। পর্যবেক্ষণশক্তির এই বিশেষত্বই গ্রন্থটিকে স্বতন্ত্র মহিমায় চিহ্নিত করেছে।

কারাগারে অন্তরীণ চৌদ্দশ' বন্দীর মধ্যে একুশজন রাজবন্দীর এক-জন কথক স্বয়ং। তার ব্যক্তিগত জীবনের প্রণয়, আবেগ, অনুভব, আত্মসমীক্ষাজাত রক্তক্ষরণ এবং সর্বোপরি একটা আদর্শিক উপলব্ধির বিন্যাস উপন্যাসে স্বতন্ত্র ধারায় বহমান। এই মৌল কাহিনীধারার সাথে সংযুক্ত হয়েছে সাজাপ্রাপ্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ব্যক্তিক ও সামাজিক অস্তিত্ব। একটা সীমাবদ্ধ অবস্থানের মধ্যে সামাজিক মানুষেরা যে আরেকটা স্বতন্ত্র জগৎ নির্মাণ করেছে, অবলোকনশক্তির ব্যাপ্তি ও গভীরতায় লেখা তার সমগ্রতাকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

একটা নিরীহ বর্ণনার মধ্যদিয়ে উপন্যাসের সূচনা----কথকের ব্যক্তিগত জীবনধারার সাথে যার সম্পর্ক নিগূঢ়:

> বিভার চিঠি এসেছে। ওর কাছ থেকে নিয়মিত চিঠি পাই। মেয়েটা সত্যি ভাল। মেয়েটা ভাল অর্থাৎ আমার জন্য ও

আপনাকে বিকিয়ে দিয়েছে। সম্ভবতঃ এই জন্যই আমি ওকে ভাল মেয়ে বলি। বিচারের মানদণ্ডটা আমরা এইভাবেই তৈরী করে থাকি।[৯]

কথক রুনু এবং তার প্রণয়ী----যদিও সে সম্পর্ক নির্দ্বন্দ্ব এবং মীমাংসিত নয়----উপন্যাসের সূচনা এবং পরিণতির মধ্যে গভীর যোগসূত্র স্থাপন করেছে। এই কাহিনীস্রোত নিতান্তই আন্তর্জাগতিক— বাইরের বিপুল ঘটনাপ্রবাহ থেকে তার গতিবিধি স্বতন্ত্র। কিন্তু কারাগারের অন্তরালে অবস্থানরত প্রতিটি ব্যক্তিই যেন সমাজের একেকটা শ্রেণীর প্রতিনিধি, সমষ্টিগত অস্তিত্বের একেকটা Projection, অভিক্ষিপ্ত অঙ্গ। বৃহত্তর সমাজ-জীবনের রূপক যেন এই কারাগার। ঔপন্যাসিকের আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের প্রতিফলনে গ্রন্থবিধৃত কাহিনী হয়ে উঠেছে প্রাণপ্রদীপ্ত ও ব্যঞ্জনাময়। এবং গভীরতর সেই অর্থে আত্মজৈবনিক, যা কেবল ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ ও কর্মধারাকেই বোঝায় না, নির্দেশ করে 'সূক্ষ্ম অনুভববেদ্য, সতর্ক-ইন্দ্রিয় ও তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির আত্ম-অভিজ্ঞতা-অর্জিত বহুস্তরীভূত চেতনাপ্রবাহকে।'[১০] বাংলা উপন্যাসে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে এ-উক্তি সর্বাংশে প্রযোজ্য নয় সত্যি, কিন্তু সত্যেন সেনের মীমাংসিত রাজনৈতিক অভিজ্ঞানের অন্তরালেও যে একটা দ্বন্দ্বময় মানবিক অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিলো, তারই স্তরবহুল সত্যস্বরূপ "রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ" থেকে লভ্য।

জীবনের দুইটি রূপ: একটি বহির্গত, অপরটি অন্তর্গত। বৃহত্তর সমাজসংগঠনের অভিক্ষিপ্ত অস্তিত্বপুঞ্জের উক্ত দু'টি রূপই এ-উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। বিভার চিঠিতে যখন উচ্চারিত হয়— 'তোমাকে বাদ দিয়ে আমার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই'— তখন কথকের বস্তুবাদী হৃদয়তন্ত্রে আকস্মিক অভিঘাত লাগে বটে, কিন্তু তাঁর সংবেদনশীলতা একে সর্বাংশে অস্বীকার করতে পারে না।

...ঝোঁকের মাথায় যা-ই বলি না কেন, আমরা জেলখানার বাশিন্দারা সত্য সত্যই তো আর মৃতদেহ নই, তবে কিছুটা মুমূর্ষু এ পর্যন্ত বলা যেতে পারে। আমাদের সজীব করে তোলবার জন্য বাইরের তাজা অক্সিজেনের প্রয়োজন রয়েছে। বাইরের

> শ্রীমতী বিভা এবং তজ্জাতীয়রা এই অক্সিজেনের যোগান দিয়ে থাকেন।··· মাস কয়েক আগে বিভা কিছুদিন রোগে শয্যাশায়ী হয়েছিল, চিঠি লিখতে পারেনি। সেই সময় অক্সিজেনের অভাবে আমার ভেতরকার কাতরানাটি বিভা টের না পেলেও আমি তো আর নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারি না।[১১]

বৈজ্ঞানিক অনুষঙ্গবাহিত হলেও সংবেদনঘন ব্যক্তি-অস্তিত্বের স্বরূপ এ-তে সুস্পষ্ট। বাইরের আবরণের সাথে এই অন্তর্গত চৈতন্যের দ্বন্দ্বময় গতিবিধিই উপন্যাসটিকে মানবিক আবেগ-অনুভব-উপলব্ধিতরঙ্গিত হতে সহায়তা করেছে। কথকের একটি স্বীকারোক্তির মধ্যেই তাঁর অস্তিত্ব-সমগ্রতার প্রতিফলন বিধৃত :

> আমার মনের দুটো অংশ। একটা আত্মম্ভরি। সস্তা বেলুনটাকে সে-ই ফুলিয়ে রাখে। আর একটা সমালোচক। তার কাছে অনুক্ষণ ঘা খেয়ে খেয়ে আমি ক্ষত-বিক্ষত। তীক্ষ্ম আত্মবিশ্লেষণের খোঁচায় বেলুনটাকে ফাঁসিয়ে দিতে চায়। মনের এই দুটো অংশের লড়াই অবিরাম চলছে।[১২]

আত্ম-উন্মোচনের এই শৈল্পিক স্বতঃস্ফূর্ততা দিয়ে কাহিনীর সূচনা হলেও নির্দিষ্ট আয়তনবদ্ধ ব্যক্তিঅস্তিত্বপুঞ্জের অন্তর-বাহিরের স্বরূপ সমগ্র উপন্যাসকে একটা সর্বজনীন ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করেছে।

ব্যক্তিক ও সামাজিক অস্তিত্বের এই অভিক্ষিপ্ত অংশের একেকটি স্বরূপ হাসু মিঞা, আবুল, আনোয়ার, মানিক, অশোক, কাদের সাহেব, কামাল, মনসুর, আলিমুদ্দিন, রফিক, ফজলু মিঞা, উকিল সাহেব, বেনু, কাশেম, অনিমেষ, সাধন, জাফর, পুলিন, বরদা বাবু, এরফান মিঞা, আলী বক্স, আউয়াল প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। বিভা-অতীশকেন্দ্রিক আরেকটি রক্তাক্ত কাহিনীস্রোত এই নির্দিষ্ট আয়তনবদ্ধ জীবনের মধ্যে বাইরের জীবনতরঙ্গকে সঞ্চার করেছে। বহির্জাগতিক তরঙ্গপ্রবাহের আরেকটি রূপ মনসুরের স্ত্রী সালেহার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত।

মালগুদামের ফালতু হাসু মিঞার স্ত্রী প্রদত্ত চিঠিসূত্রে সমাজসত্যের একটা নেতিবাচক রূপ উন্মোচিত হয়েছে, যেখানে তার স্ত্রী সামাজিক

চাপের মুখে সঙ্কটগ্রস্ত হয়ে প্রিয় স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছেদ প্রত্যাশা করেছে:

> গ্রামের আর সবাই পরামর্শ দিচ্ছে আর কারু সঙ্গে ঘর করতে। নইলে এই বদমাইশদের মেলে সে তার মান-ইজ্জত নিয়ে থাকতে পারবে না। ···ইয়াকুব মাতব্বরের মেজো ছেলে তার কাছে নিকাহ্‌র প্রস্তাব পাঠিয়েছে। বলতে তার বুক ফেটে যাচ্ছে তবু না বলেও উপায় নেই, আর কোন পথ না পেয়ে সে এই প্রস্তাবে মত দিয়েছে। এখন হাসু যেন দয়া করে তাকে ছাড়ান দিয়ে দেয়।[১৩]

সমাজজীবন যখন শোষণে-নিষ্পেষণে চরম সঙ্কটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন অন্ধকার কারা কক্ষের মধ্যেও তার অভিঘাত কতোটা মর্মন্তুদ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হতে পারে, উপন্যাসের একাধিক ঘটনাংশে তার স্বরূপ সুস্পষ্ট। এই সামাজিক সংঘাতবৈগুণ্য কথকের মীমাংসাপ্রবণ চৈতন্যে সঞ্চার করেছে মানবিক রক্তক্ষরণ: 'যে তার পরম ভালবাসার জন, সে তার বিচ্ছেদের দুঃসহ ভারে ভেঙে পড়ছে, একথা ভাবতে কে-ই বা ভালবাসে! মানুষ এমনি নিষ্ঠুর আর এমনি স্বার্থপর। ওর বেদনার রসে আমার মনটা পূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঠিক সেই সময় আমার মনশ্চক্ষে হাসুর করুণ মুখচ্ছবি ভেসে উঠল। আমি আর হাসু ----জীবন সমুদ্র মন্থন করে একজন পেলাম অমৃত, আর একজন গরল। কিন্তু সেজন্য কি আমি দায়ী? দায়ী নই, তবু কেমন একটা গ্লানিতে ভরে গেল মনটা। বিভার চিঠি তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে রাখলাম। মানুষ কি শুধুই স্বার্থপর? তা নয়।'[১৪] সমাজদেহের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য যাদেরকে অবরোধের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাদের প্রিয় পরিজনও তো প্রতিনিয়ত সেই দূষিত সামাজ-সংস্পর্শেই হচ্ছে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত। এভাবেই বাইরের ঘটনাস্রোত একেকটা চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। প্রবৃত্তির ঘৃণ্য তাড়নার শিকার সাজাপ্রাপ্ত আবুল, ডাকাতি কেসের আসামী আনোয়ার প্রভৃতির জ্ঞাত-অজ্ঞাত কাহিনীর বহির্জাগতিক অভিক্ষেপ কারান্তরালের জীবনপ্রবাহকে বার বার ক্ষতবিক্ষত করেছে। কাদের সাহেব, বরদাবাবু বা উকিল সাহেবের চরিত্র সমাজের একেকটি শ্রেণীর

প্রতিনিধিত্বে স্বতন্ত্র। মনসুরের অবস্থিতি একক অস্তিত্ব নিয়েই বিরাজ করে না, তার স্ত্রী সালেহাকেন্দ্রিক জীবন কারাগারের নিস্তরঙ্গ পট-ভূমিতেও স্পন্দন সৃষ্টি করে। জাফর-কাশেমের পারিবারিক সঙ্কট, ফজলু মিঞার সমস্যা—সব কিছু মিলিয়ে বাইরের বৃহত্তর জীবন বারবার অভিঘাত সৃষ্টি করে। বাইরের দিক থেকে অবরুদ্ধ কিন্তু মানসিক ক্রিয়ায় তরঙ্গময় জীবন সম্পর্কে কথক রুনু বাবুর অভিমত উল্লেখ-যোগ্য—যেখানে তিনি একটা দার্শনিক মীমাংসা সন্ধানের প্রচেষ্টায় অন্তরঙ্গ:

> ...তবু আমরা সবাই স্বতন্ত্র। সাতটি রংয়ের সুসমাবেশে সূর্যরশ্মি। আবার আকাশের এক বিশেষ পটভূমিকায় সেই রশ্মি রামধনুর বর্ণালীতে বিচিত্রিত হয়ে ওঠে। কোনটি সত্য—সূর্যরশ্মি না, রামধনু? দুটোই সত্য। তেমনি করেই সত্য আমাদের ভিতরকার এই মিল আর গরমিলগুলো।
>
> ...কিন্তু এই সমস্ত বহুমুখী গরমিল নিয়েও আমরা মিল রেখেই চলেছি। এইটাই সবচেয়ে বড় কথা। আমাদের এই সীমাবদ্ধ বন্দীজীবন হচ্ছে আমাদের নিজেদের ভিতরকার অসংখ্য গরমিলের সামঞ্জস্য স্থাপনের বিরতিহীন ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। সমগ্র মানবসমাজও কি এই একই ধারা অনুসরণ করে এগিয়ে চলছে না?[১৫]

মনসুরের মধ্য দিয়ে জীবনের অন্যতর সঙ্কটের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। স্বামীগতপ্রাণা সালেহা মনসুরের জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে প্রেরণা-উৎস হলেও তার আত্মশক্তির উজ্জীবন বা সাবলম্ব হবার ক্ষেত্রে একটা অভেদ্য দেয়ালের মতো বিদ্যমান। মনসুরের আত্মবিশ্লেষণে সে সত্যই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কৃষিজীবী সমাজের শিক্ষিত তরুণদের সমাজবিচ্ছিন্ন ও আত্মবিচ্যুত অবস্থার রূপায়ণ মনসুরের জীবনাচরণ ও উক্তিতে প্রতিফলিত। যেমন:

> এটা সত্যি কথা যে, আমি পড়াশুনা খুবই ভালবাসি। তেমনি এও সত্য যে, I hate work, আমি কাজকে এড়িয়ে চলতে চাই। ছোটবেলা থেকে এইভাবে চলতেই আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। This vice is ingrained in me, as a consequence

of which I find no confidence in any sort of practical work. I can speak, I can argue in any theoretical discussion, but in the day to day Afairs of practical use, I have no alternative but to keep mum এবং যখনই বৈষয়িক ব্যাপারে সামান্য মাত্র সঙ্কট দেখা দেয়, I prove myself absolutely worthless. What a life !

...I have spoilt myself and have spoilt by those who loved me best. My peasant parents gave their lives to make a gentleman out of me and my Saleha gave the finnishing touch by turning the gentleman into on indolent drone.[১৬]

মনসুরের এই দ্বন্দ্বময় জীবনচৈতন্য তার এযাবৎকাল-অর্জিত জ্ঞান এবং বস্তুজাগতিক অভিজ্ঞতা-উৎসারিত। এভাবেই মনসুর চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজসত্যের অন্যতর গভীরতর রক্তাক্ত ক্ষতের বেদনাদীর্ণ রূপ উন্মোচিত হয়েছে উপন্যাসে।

উপন্যাস-কাহিনীর আরেকটি রক্তাক্ত ধারা হলো অতীশ প্রসঙ্গ। সে কারান্তরালে বন্দী নয়, কিন্তু জীবনের মোহ ও সংবেদনশীলতার কাছে পরাভূত। বিভাপ্রদত্ত পত্রের মাধ্যমে উন্মোচিত চিত্র পাঠকচৈতন্যকে আলোড়িত করে প্রবলভাবে। বিভার প্রতি একমুখী প্রণয় যে-আত্ম-বিলুপ্তির স্রোতে নিক্ষেপ করেছে অতীশকে, লেখকের অন্তর্দৃষ্টি তার যথার্থ স্বরূপটিকে অভিব্যক্ত করেছে।

সমাজসত্যের বিচিত্র প্রান্তকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করেছেন লেখক কথকের অনাসক্ত অনুভবপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। যে-কারণে কথক যে ঔপন্যাসিকেরই আত্মজৈবনিক প্রতিভাসের প্রতিচিত্র, তাঁর জীবনাগ্রহের ঔপনাসিক চরিত্ররূপ মাত্র, তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। উকিল সাহেবের কর্মধারা প্রসঙ্গে কথকের যে গভীর বিবেচনাশক্তির প্রকাশ ঘটেছে, তা সমাজসত্যের অন্তর্মূলস্পর্শী :

বিচারপতির চোখে ধূলি দিয়ে অপরাধীর অপরাধকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য বা নিরপরাধের অপরাধকে সুপ্রমাণিত করবার

জন্য তিনি তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধির ব্যভিচার করবার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। এর মর্ম ধর্মাধিকরণে অধিষ্ঠিত বিচারপতিরা জানেন, জনসাধারণ জানে, কিন্তু সকলেই একে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করে নিয়েছে।

দীর্ঘ দিন ধরে এই প্রথাপ্রচলিত হয়ে এসেছে। সমাজের অনুমোদন তার নগ্নতাকে ঢেকে দিয়েছে, ঐতিহ্যগত অভ্যাস আমাদের বিচারশক্তিকে ভোঁতা করে দিয়েছে। তার ফলে এর মধ্যে কোন অসঙ্গতি আমাদের চোখে পড়ে না, এমন করে আমি তো কোনদিন ভেবে দেখিনি।[১৭]

আর কথক, রুনু বাবু নিজে? তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা, জীবনবোধের দ্বন্দ্বময় ও মীমাংসাপ্রবণ গতিপ্রক্রিয়া, হঠাৎ উদ্বেলিত চৈতন্যের সংবেদনময়-বিস্তার, জীবনযন্ত্রণার নিঃসঙ্গ কাতরোক্তি অভিক্ষিপ্ত সমাজসত্যকে অতিক্রম করে উপন্যাসের পরিণামী উপজীব্য হয়ে উঠেছে। তাঁর অবরুদ্ধ জীবনের স্তরীভূত চৈতন্যযাত্রার বহ্নিজ্বালায় ইন্ধন সঞ্চার করেছে বাইরে থেকে বিভা স্বয়ং----অতীশ বা রুনুর অস্তিত্ব হনন করে নয়, নিজের মর্মন্তুদ পরিণতির ট্রাজিক বেদনা বিস্তারের মাধ্যমে।

কথকের বেদনাময় চেতনার উন্মোচন ঘটে বিভার চিঠির বক্তব্যে। বিভা তাঁকে নিজ অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করলেও তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব অনতিক্রম্য। শুধু তা-ই নয়---রুনুর ধারণায় অতীশ-বিভার মিলনের পথেও তিনি 'দু জনের মাঝখানে এক অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধক।' এই আত্মগ্লানি, বেদনা ও অপরাধবোধে তিনি ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হতে থাকেন। এই বেদনাময় আত্ম-উন্মোচনের মধ্যেই তার মীমাংসা ও আত্ম-বিশ্লেষণের স্বরূপ অভিব্যক্ত হয় :

আমাদের দু'জনের মধ্যে এই যে সম্পর্ক তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, থাকতেও পারে না। এদেশ আর ওদেশ, মাঝখানে বিচ্ছেদের মহাসমুদ্র। আমাকে এখানেই থাকতে হবে, আর ও থাকবে ওখানে। এই বাস্তব সত্যটাকে আমিও মেনে নিয়েছি, সে-ও মেনে নিয়েছে। এবিষয়ে আমরা দু'জনেই সচেতন। তবু কেন এই মায়া?

আমার বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই, আমি শুধু অতীতের ছায়া। মানুষের জীবনে বহু ছায়াপাত হয়, সেই ছায়ার মধ্যে অপরিমিত ঐশ্বর্যও থাকে। কিন্তু তাই বলে শুধু ছায়া নিয়ে তো আর জীবন চলে না। পিছনের দিকে তাকিয়ে অতীতের স্বপ্নের মধ্যে ডুবে থাকা গতিশীল জীবনের ধর্ম নয়।[১৮]

কিন্তু এই মীমাংসা ও আত্মবিশ্লেষণ সত্ত্বেও ভিতর থেকে আর একজন কে যেন তীক্ষ্ণসুরে বলে ওঠে---'···এই কি তোমার অন্তরের কথা? তুমি যা-ই বলনা কেন, তোমার ভিতরের খবর কি আমি জানি না। ···যদি সত্যসত্যই তোমার আন্তরিকতা থাকে, তবে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নাও। চিঠিপত্র দিও না, সমস্ত সম্পর্ক ছেদ কর।' এ-ভাবেই তার মীমাংসা-সন্ধানের প্রয়াস অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। কিন্তু অন্তরের এই গভীর আকর্ষণ তো সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আইনের ভ্রুকুটিতে অনিবার্য প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। বিভার চিঠির জন্য তাঁর ব্যাকুল প্রতীক্ষার চঞ্চলতা রাবীন্দ্রিক স্পন্দন নিয়ে বারবার ঘুরে ফিরে জাগ্রত হয়:

Have you not heard her silent steps
She comes, comes, ever comes.

সে যে আসে আসে আসে।
অবশেষে বিভা এল। ওর এমন রূপ তো কোন দিন দেখিনি?[১৯]

বিভার এই চিঠি যেমন রুনুর মহোৎসব, তেমনি বিভারও অন্তিম মুহূর্তের আকস্মিক আলোক-উদ্ভাসন। জীবনের আনন্দ ও যন্ত্রণার সর্বময় উন্মোচন, রাজবন্দী রুনুর জন্য হৃদয়ের সকল অর্ঘ্য নিবেদন করে সুদীর্ঘ পত্র শেষ করে বিভা। রুনু এর মধ্যে প্রেরণাকেই অনুভব করেছে, কিন্তু, 'তার দু'দিন বাদে বড়দির চিঠি পেলাম। সেই যে অনেক দিন আগে একবার আমাকে আক্রমণ করে চিঠি লিখেছিলেন, আজ তারপর এই দ্বিতীয় চিঠি। কিন্তু আজ তাঁর চিঠিতে কোন অনুযোগ নেই, কোন অভিযোগ নেই, তবে যা আছে তা মর্মান্তিক।'[২০] সেই মর্মান্তিক সংবাদটি হলো: বিভার ক্যান্সার হয়েছে। 'মারাত্মক রকমের ক্যান্সার'।

রুদ্ধদ্বার জীবনের সংকীর্ণ আয়তনে যে মুক্তপ্রাণের উদ্দামতা বিভার চিঠি প্রতিনিয়ত বহন করে আনতো, তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল চিরতরে:

> আবার নতুন করে ওর পত্রগুচ্ছ পড়লাম। এবার ওর কথাগুলি নতুন অর্থ নিয়ে আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এবার আর কিছুই বুঝতে বাকী নেই। এই তার বিদায় সঙ্গীত, it is her swang song.[২১]

যে-বিভা জোর করে রুনুর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করতে চেয়েছিল, বর্বর প্রতিরোধের মুখেও যে বলেছিল 'আমি জায়গা করে নেব, তুমি ভেবো না।' —সে-ই শেষ পর্যন্ত আপন অধিকার সীমা থেকে চিরতরে মিলিয়ে গেল:

> সবকিছুই যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ রাত্রি, কোন কিছু সাড়াশব্দ নেই, শুধু বহু দূর থেকে ভেসে আসা একটি কথা তরঙ্গিত হয়ে উঠছে—
>
> সে আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে!
>
> এমন সময় জেলখানার ঘন্টার শব্দে চমকে উঠলাম।[২২]...

সমাজসত্য ও ব্যক্তির অন্তর্সত্যের এই সমন্বয় "রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ" উপন্যাসকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছে। সামাজিক নিয়ম-নীতির বৈগুণ্য কিভাবে ব্যক্তিকে সমষ্টিগত জীবন থেকে, তার আনন্দময় জীবন-উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক লৌহকঠিন নৈঃসঙ্গ্যের মধ্যে নিক্ষেপ করে, এ-উপন্যাসের কথক ও বিভার জীবনকথায় তা-ই অভিব্যক্ত হয়েছে। রাজনৈতিক আদর্শ তো আর আকাশ থেকে পতিত হয় না, জীবনের সমগ্রতাকে কেন্দ্র করেই তার স্বীকৃতি ও বিস্তার। একটা জীবনের মধ্য দিয়ে একটা সমাজের নেতিবাচক স্বরূপই যেন "রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ"-এ শব্দরূপ পেয়েছে।

ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ হিসেবে "রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ" উপন্যাসের সীমাবদ্ধতা প্রচুর। কাহিনীবিন্যাসে অসংহতি অবয়বগত সমগ্রতা দান করেনি এ-উপন্যাসকে। কিন্তু যেখানে জীবনই মুখ্য, যেখানে সমাজ, রাজনীতি ও সমষ্টিগত জীবনের অনিবার্য খণ্ডন বস্তুগত অনিবার্যতায়

অনতিক্রম্য----সেখানে জীবনের নিটোল সংহতির রূপায়ণ অসম্ভব। সত্যেন সেনের প্রথম পর্যায়ের সাহিত্যকর্ম হিসেবে "রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ" --এর গুরুত্ব অপরিসীম।

চার

সমাজজীবনের সমগ্র প্রান্তস্পর্শী চারিত্ররূপ বিধৃত হয়েছে "পদচিহ্ন"[২৩] উপন্যাসে। আত্মজৈবনিক ঘটনার প্রতিফলনজাত[২৪] হলেও একটা বিশেষ কালের সমাজবাস্তবতার অঙ্গীকারে সত্যেন সেনের এ-উপন্যাস বিশিষ্ট। তিরিশের দশকের শেষ দিকে জেলখানা থেকে মুক্তিলাভের পর[২৫] আত্মীয় স্বজনের আকর্ষণ, শান্তিনিকেতনের বৃত্তি প্রভৃতি মোহনীয় প্রলোভনকে উপেক্ষা করে একজন পরিপূর্ণ মার্কসবাদী কর্মী হিসেবে আত্মনিয়োগ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তিনি। ফলে, 'সব অনুরোধ বা সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে তিনি চলে এলেন বিক্রমপুর—নিজের গ্রামে। সেখানে যুক্ত হলেন কমিউনিস্ট পার্টির সাথে। কাজ নিলেন কৃষক আন্দোলন গড়ার। কৃষক আন্দোলন গড়তে গিয়ে তিনি শুধু বিক্রমপুর নয়, ঢাকা জিলার নরসিংদী এলাকার বিভিন্ন গ্রামের সাথে পরিচিত হলেন গভীরভাবে।'[২৬] গ্রামজীবনবাস্তবতাকে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে অবলোকন করার মতো অভিজ্ঞতা রাজনৈতিক জীবনের সক্রিয়তার সূত্রেই তিনি অর্জন করেন। কিন্তু 'পদচিহ্ন' উপন্যাসে বিধৃত গ্রাম তিরিশ বা চল্লিশের দশকের গ্রাম নয়, বিভাগোত্তর কালের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কটের আবর্তে ক্ষতবিক্ষত গ্রাম।

বিভাগোত্তর কালের বাংলাদেশের সামাজিক সঙ্কটভিত্তিক উপন্যাস হিসেবেই কেবল নয়, জীবনের বহির্বাস্তবতার সাথে অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনের সমন্বয়ে "পদচিহ্ন" বিশিষ্ট। বাংলা উপন্যাসে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার চিত্রায়ণ বিভাগ-পূর্বকালে রচিত একাধিক উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু বিভাগোত্তর কালের পাকিস্তানশাসিত বাংলাদেশে এই সমস্যার স্বরূপ ছিলো স্বতন্ত্র। সত্যেন সেনের নির্মোহ সমাজ-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনে হিন্দু-মুসলিম সঙ্কট এ-উপন্যাসে যথার্থ স্বরূপ নিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু জীবনের বহির্গত রূপ-বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের অন্তর্জীবনে যে পরিবর্তন ও সঙ্কট

অনিবার্য হয়ে ওঠে, "পদচিহ্ন" উপন্যাসে লেখক তার রূপায়ণে অনেকাংশে সক্ষম হয়েছেন বলা চলে।

উপন্যাসের সূচনায় একটা নাটকীয় পরিচর্যায় গ্রন্থ-বিধৃত কাহিনীর উন্মোচন ঘটিয়েছেন লেখক। এই নাটকীয়তা যেন সমাজজীবনের নাটকীয় পরিবর্তনের অনুষঙ্গী। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষারত দুই বন্ধু সুবিনয় ও আনিস। এঁদের বন্ধুত্ব কেবল মানবিক সম্পর্কসূত্রেই নয়, প্রগতিশীল জীবনবোধ ও রাজনৈতিক মতাদর্শের অভিন্নতায় এই বন্ধুত্ব গভীর ও মেধানিয়ন্ত্রিত। অবশ্য লেখক সুস্পষ্টভাবে এই আদর্শ-বোধের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করলেও, উপন্যাসে বিধৃত এঁদের আচরণ ও কর্মধারা থেকে তা-ই প্রমাণিত হয়। নাগরিক জীবনে লালিত-বর্ধিত আনিস সুবিনয়ের গ্রামের বাড়িতে গমন-ইচ্ছুক। তার এই আকাঙ্ক্ষার কারণ বৃহত্তর গ্রামজীবনকে প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করা। সুবিনয়ের নিজগ্রাম শ্রীপুর ও তার পরিপার্শ্ব এ-উপন্যাসের পটভূমি।

একটা নাটকীয় আকস্মিকতায় উপন্যাস-কাহিনীর উন্মোচন ঘটেছে। সূচনাংশটি নিম্নরূপ :

> কুকুরটা হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। যামিনী মিত্র আর তার স্ত্রী প্রমীলা তখনও ঘুমিয়ে পড়েননি, শুয়ে শুয়ে সংসারের সুখ-দুঃখের কথা বলাবলি করছিলেন। এত রাত্রিতে কুকুরটাকে হঠাৎ এমন করে ডাকতে শুনে ওরা ভয়ে ধরমর করে উঠে বসলেন। আসলে রাত্রি খুব বেশী হয়নি, কিন্তু গ্রামের রাত্রি তো। তা ছাড়া যা দশা হয়েছে গ্রামের, সন্ধ্যা হতে না হতেই যেন মাঝরাত্রি হয়ে যায়।[২৭]

কুকুরের চীৎকারে দু'বছর পূর্বের একটি ভয়াল রাত্রির ঘটনা মনে পড়ে যায় যামিনী মিত্রের, তার স্ত্রী প্রমীলার। সেদিনও কুকুরের চীৎকারে যামিনী মিত্র ঘরের বাইরে বেরোতেই ডাকাতের নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। তাঁদের সর্বস্ব হয়েছিলো লুণ্ঠিত। এ-অবস্থায় ঘরের বাইরে বেরোনোটা সঙ্গত কিনা এই দ্বন্দ্বময় অস্থিরতার মাঝে বাইরে একান্ত আপন জনের উচ্চ হাসির শব্দ শোনা যায়। পরিণাম দাঁড়ায় এই যে যামিনী মিত্রের 'বড় ছেলে সুবিনয় ওরফে বাদল এসেছে। তার সঙ্গে তার এক বন্ধু। সুবিনয় এম.এ. ক্লাশের ছাত্র। ঢাকায় পড়ে।' প্রায়

তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী যামিনী মিত্র ও তার পরিবারভুক্ত সদস্যদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতার যে চিত্র উন্মোচিত হয়ে উঠেছে, সেখানে বিভাগোত্তর কালের বাংলাদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত হিন্দু-পরিবারের যথার্থ বাস্তবতাই যেন প্রতিবিম্বিত। প্রাথমিক অস্থিরতা, অতঃপর শহরে অধ্যয়নরত সন্তানের আকস্মিক আগমনে আনন্দ-উল্লাসমুখর ক্ষুদ্র পারিবারিক আবহে আরেকটা সঙ্কট তাৎক্ষণিকভাবে হলেও, প্রবল রূপ ধারণ করে—যার উৎস সংস্কারগত জীবনাচারের গভীরে। এ-অবস্থার উন্মোচনটিও নাটকীয়। যেমন :

> সুবিনয়ের বন্ধু আনিস সুবিনয়ের দেখাদেখি তাদের প্রণাম করল। সুবিনয় পরিচয় করিয়ে দিল, আমার বন্ধু আনিস।
>
> আনিস! চমকে উঠলেন যামিনী।
> আনিস! চমকে উঠলেন প্রমীলা।
>
> ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হয়ে উঠল আরতি। দাদা একি কাণ্ডটা করে বসল![২৮]

মানুষের মধ্যে অন্তর্গত যে চিরায়ত মানবসত্তা বিদ্যমান, তারই আলোক-উদ্ভাসনে এই সাম্প্রদায়িক সংস্কারের পারিবারিক মীমাংসা সংঘটিত হয়। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে এই সমস্যাটিই বিভিন্ন স্বরূপে অভিব্যক্ত হতে থাকে। শহরের ছেলে আনিস গ্রামজীবন বিশেষ করে হিন্দু পরিবারের জীবনযাত্রাকে অন্তরঙ্গভাবে অবলোকন করতে আগ্রহী। এই আগ্রহের পেছনে যেমন, তেমনি প্রাচীন সংস্কারপন্থী পরিবারের ছেলে সুবিনয়ের সেই আগ্রহের প্রতি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতির মধ্যে একটা বিকাশমান দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন জড়িত। পারিবারিকভাবে উদ্ভূত এই জিজ্ঞাসা, বিস্ময়, উৎকণ্ঠা ও তার মীমাংসা ঘটলেও উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনা-স্রোতে এ-সঙ্কটটি একাধিকবার প্রবলরূপ ধারণ করেছে। সত্যেন সেনের অভিজ্ঞানমণ্ডিত জীবন ও সমাজদৃষ্টি সেই সঙ্কটময় সমাজবাস্তবতাকে যথার্থ শিল্পীর নির্মোহ নৈর্ব্যক্তিকতায় অবলোকন করেছে উপন্যাসে। মানুষের জীবন তো সমাজবিবিক্ত নয়। কিন্তু সমাজবিযুক্ত জীবনের বিচিত্রমাত্রিক সমস্যা ও সঙ্কট স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। বিশেষ করে একটা অবৈজ্ঞানিক রাজনৈতিক মীমাংসার ফলে ১৯৪৭ পরবর্তী

বাংলাদেশের সমাজজীবনে এই সঙ্কটের স্বরূপও জটিল ও স্তরবহুল হতে বাধ্য। ৪৭-এর রাজনৈতিক সমাধানটি যদি সমাজ-ইতিহাসের গতিশীল ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত হতো, তাহ'লে হয়তো এই সঙ্কটের চারিত্র হতো ভিন্নতর। যামিনী মিত্র বা তার স্ত্রী প্রমীলা মানবিক ঔদার্যে তাঁদের এযাবৎকাললালিত সংস্কারবোধকে জয় করলেও বহিরারোপিত অব্যবস্থা ও জটিলতা এই সঙ্কটকে বারবার তীব্র করে তুলেছে। উপন্যাসের ঘটনা-পরম্পরায় সে-সত্যই প্রতিপন্ন হয়েছে বারবার।

হিন্দুপ্রধান বধিষ্ণু গ্রাম শ্রীপুর। বিভাগ-পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক-সামাজিক অভিঘাতে সেই গ্রাম বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের শেষ-প্রান্তে এসে এখন হৃত-ঐশ্বর্য। যামিনী মিত্র সেই গ্রামের বাশিন্দা। কিংবদন্তির 'দারোগা বাড়ী' এখন যামিনী মিত্রের ক্ষুদ্রকায় সংসারের অস্তিত্ব নিয়ে কেবল টিকে আছে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ষড়যন্ত্রে ভারত বিভক্ত হলে পাকিস্তান-অন্তর্গত হিন্দু সম্প্রদায় স্বাভাবিকভাবেই একটা বিপন্ন অবস্থায় পতিত হয়। যামিনী মিত্র যেন সেই বিপন্ন অস্তিত্বের সর্বগ্রাসী দীর্ঘশ্বাস। যামিনী মিত্রের পাকিস্তান ত্যাগ না করার কারণ ও তার স্মৃতিময় যন্ত্রণার উন্মোচন প্রসঙ্গত উদ্ধৃতিযোগ্য :

> সেই এককালের জমজমাট দারোগা বাড়ীতে এখন শিব-রাত্রির সলতের মত টিম টিম করে জ্বলছে যামিনী মিত্রের সংসার। মাঝে মাঝে উলটো-পালটা হাওয়ার ঝাপটা যখন আসে, তখন মনে হয়, এই সলতেটুকুও বুঝি নিভে যাবে। পঞ্চাশ সালে এই রকম একটা হাওয়া এসেছিল, যামিনী মিত্র জিনিসপত্র বেঁধে ছেঁদে তৈরী হয়েও ছিলেন। কিন্তু বাদ-সাধল তার মা। বুড়ী বলল, তোদের মেতে মন হয়েছে, তোরা যা, আমি আমার শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। বুড়ী এমন বাঁকাই বেঁকে বসল, কেউ তাকে সোজা করতে পারল না।...
>
> আসলে পাকিস্তান হওয়াতে বৈষয়িক দিক থেকে যামিনী মিত্রের কিন্তু সুবিধাই হয়েছে। যেটুকু জমিজমা আগে ছিল, তাতে কোনমতে টেনেটুনে সংসার চলত। ভাইরাও মাঝে মাঝে

> মার নাম করে কিছু কিছু পাঠাত। কিন্তু কয়েক বছর বাদে সেই টাকা আসার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তার ফলে হিন্দুদের দেশত্যাগের মাত্রা আরও বেড়ে চলল। যে সব আত্মীয়স্বজন দেশ ছেড়ে চলে গেল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের জমিজমা তার হাতে বুঝিয়ে দিয়ে গেল। এর ফলেই সুবিনয়ের পক্ষে ঢাকা শহরে থেকে এ পর্যন্ত পড়া সম্ভব হয়েছে।...
>
> যামিনী মিত্র এখন বসে বসে সেই সব দিনের স্বপ্ন দেখেন। কোথায় গেল সেই গ্রাম? শ্রীপুর হিন্দু প্রধান গ্রাম। গ্রামের পূর্ব-প্রান্তে ও উত্তর প্রান্তে মাত্র দুটি মুসলমান পল্লী। হিন্দুদের অধিকাংশ চাকুরীজীবীদের পরিবার, পোষ্য। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হবার পর এই অংশটাই প্রথম দেশ ত্যাগ করতে লাগল। তারপর তাদের অনুসরণ করে চলল ধোপা, নাপিত, কামার, কুমারের দল। এইভাবে কখনও ধীরে কখনও জোরে গ্রামের লোক-সংখ্যা ক্রমেই কমতে লাগল। অবশেষে শেষ ধাক্কা এল পঞ্চাশ সালে। সমস্ত গ্রামটা যেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিয়ে গেল। এখন সারা গ্রামে ৫/৭ ঘর হিন্দু বাকী আছে।[২৯]

এই বর্ণনায় নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে ঔপন্যাসিক যেন বিশেষ সময়ের সমস্ত বাংলাদেশের চিত্র উন্মোচন করেছেন। দীর্ঘকালের সংস্কার-সংস্কৃতি বিচ্যুত, নিরাপত্তাহীহন জীবনবাস্তবতার স্বরূপ নির্দেশে আনিসের উদ্দেশে উচ্চারিত যামিনী মিত্রের উক্তিটিই যথেষ্ট 'আমাদের শিকড় ছিঁড়ে গেছে। এবার আমরা শুকিয়ে ঝরে পড়ব।'[৩০] আনিসের নতুন জীবনাভিজ্ঞতা অর্জনের সূচনা পর্বটি এভাবেই বিন্যস্ত হয়েছে উপন্যাসে।

যামিনী মিত্রের অনুষঙ্গে শ্রীপুর গ্রামের জীবনবাস্তবতার যে চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে, আনিসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তার-ই যথার্থতা প্রমাণিত। আনিসের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে হৃত-ঐশ্বর্য শ্রীপুর গ্রামের ভগ্না-বশেষকে রূপায়ণ করেছেন লেখক। আনিসের পর্যবেক্ষণ এবং সুবিনয়ের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে শ্রীপুর গ্রামের অতীত ও বর্তমান জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে। দেশ বিভাগের পর স্ব-ভূমিত্যাগী হিন্দুদের ঘর-বাড়ি-সম্পদের ওপর নব্য-অধিষ্ঠিত জনসাধারণের গার্হস্থ্যজীবনের অনুষঙ্গী একটি চিত্র ঃ

সবার আগে পরিত্যক্ত দালানগুলিতে তারা এক একটা করে পরিবার বসিয়ে দিয়েছে। দু'একঘর হিন্দু আর সবাই মুসলমান। এই দালানের শ্রী রক্ষা করে চলবার মত সামর্থ্য তাদের নেই। না আছে আর্থিক সংগতি, না আছে সেই শিক্ষা ও রুচি। সুন্দর একটা দোতলা দালানের রেলিংএর এক দিক থেকে আর এক দিক পর্যন্ত লাইন করে সাজিয়ে পাট শুকোতে দেওয়া হয়েছে। এ বাড়িতে এসে পাট শুকানোর বেশ সুবিধা হয়েছে ওদের। যিনি এই দালান তুলেছিলেন তিনি কি কখনো এমন কথা ভাবতে পেরেছিলেন, মনে মনে ভাবল আনিস। দরজা জানালাগুলো খসে খসে পড়ছে। যে দরজার কপাট একেবারেই খসে পড়ে গেছে, পাট কাঠির মাথা দিয়ে তার স্থান পূরণ করা হয়েছে। মনে হয় এখানে ওখানে ঘাসের উপর যেন পুলটিস মেরে দেওয়া হয়েছে।[৩১]

একটা বিশেষ জনগোষ্ঠীর বাহ্যিক জীবনের এই উপস্থাপন তার অন্তর্গত স্বরূপকেও ইঙ্গিতময় করে তুলেছে। সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ আনিসের প্রেক্ষণবিন্দুর সাথে সমন্বিত হবার ফলে উপন্যাস-অন্তর্গত জীবনচিত্র বাস্তবতাগুণ অর্জন করেছে। জীবনের এই বিবর্ণ-বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যেও যে অতীত-উৎস থেকে প্রেরণার জীবন্ময় সূত্র আবিষ্কৃত হতে পারে, সত্যেন সেন আনন্দ চৌধুরীর জীবন ও তার মর্মন্তুদ পরিণতির মধ্য দিয়ে তা-ই নির্দেশ করেছেন। আনন্দ-প্রসঙ্গ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়। আনন্দ ছিলো উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গকারী অসংখ্য অজ্ঞাত সৈনিকের একজন। কখনো উৎস, কখনো বা বর্তমান, আবার কখনো কখনো মানবমনের অন্তর্বর্তী দ্বন্দ্বময়তার স্বরূপ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে "পদচিহ্ন" উপন্যাসের কাহিনী অগ্রসর হয়েছে।

মরণ কৈবর্তদাসের মাধ্যমে অন্ত্যজশ্রেণীর হিন্দুর জীবনসমগ্রতা হয়ে উঠেছে প্রত্যক্ষগোচর। একদিকে সমাজ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যলালিত সংস্কার, অন্যদিকে অধীত জ্ঞান ও মানবপ্রগতির সাথে সম্পৃক্তি---দুটোর প্রভাবই ব্যক্তিমানুষের জীবনে অনিবার্য। মরণ কৈবর্তদাস যখন পাকিস্তান, মুসলমান প্রভৃতি প্রসঙ্গে মনোভাব-অভিযোগ ব্যক্ত করে চলেছে, তখনই সুবিনয়ের প্রগতিশীল মানসগড়নের গভীরতর উৎস থেকে

হিন্দুসংস্কার আকস্মিকভাবে হলেও মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। চরিত্রনিহিত এই দ্বন্দ্ব উদ্‌ঘাটনে সত্যেন সেন সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন:

> নিজের দেশ! মরণ ঠোঁট উলটে বলল, কি যে আপনি বলেন, আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না। সমস্ত মানুষ এক কথা বলে, আর আপনার মুখে ঠিক তার উলটো কথা। এদেশ কি এখনও আমাদের আছে? সে যখন ছিল, তখন ছিল।
>
> চমকে উঠল সুবিনয়। যেই কথাটা সে এড়াতে চাইছিল, সেইটাই আবার কেমন করে ফিরে ফিরে আসছে। তার মনে মনে আফসোস হচ্ছিল, কেন সে প্রথমেই আনিসের পরিচয় দিয়ে দেয়নি।[৩২]

সুবিনয়ের এই মানসিকতা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি, আনিসের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া অন্যতর মনোভাবের জন্ম দিতে বাধ্য। আনিস-সুবিনয়ের কথোপকথনে এ-সত্যটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুবিনয়ের চরিত্রের অভ্যন্তরস্থ দ্বন্দ্বকে অসঙ্গত মনে হয় না। উভয়ের কথোপকথনের দ্বন্দ্বের যে স্বরূপসত্য প্রকাশ পেয়েছে, তা সামসময়িক জীবনের সমগ্রতার সাথে সম্পৃক্ত। ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সমষ্টিগত জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যই যেন অভিব্যক্ত হয়েছে এখানে:

> মরণ চলে গেল। রইল বাকী আনিস আর সুবিনয়। মরণের সঙ্গে দেখা হবার আগ পর্যন্ত শ্রীপুরের ইতিকথা নিয়ে দুজনে মুখর হয়ে উঠেছিল। এই নির্জন রিক্ত গ্রামের বুকে কত কথাই যে লুকিয়ে আছে সুবিনয় নিজেও অতটা ভেবে দেখেনি। বোবা শ্রীপুর যেন তারই কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে তার হারিয়ে যাওয়া কাহিনীগুলিকে প্রকাশ করে চলছিল। হঠাৎ এর মাঝখানে মরণ এসে কি একটা ঘূর্ণি জাগিয়ে তুলল। বদলে গেল আব-হাওয়াটা, বদলে গেল মানুষ দুটি। ওরা দু'জন কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দ হয়ে রইল।
>
> হঠাৎ হেসে উঠল আনিস। সুবিনয় স্বপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল।

তোমার সঙ্গে গ্রাম দেখতে এসেছিলাম সুবিনয়। গ্রাম মানে প্রাকৃতিক গ্রাম নয় তার চেয়েও বেশী গ্রামের মানুষ। আমি শহরের ছেলে, আমি আমার স্বদেশের আন্তরাত্মার সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছিলাম। আমার স্বদেশের প্রাণ গ্রামের মধ্যে, শহরে নয়, একথা অনেকবার তুমি আমায় বলেছ। একথা আমিও বুঝি। আর যেই মাত্র গ্রামের বুকে এসে পড়েছি, সে থেকে একথা আরও ভালভাবে বুঝতে পারছি। তুমি আমাকে দেখাতে নিয়ে এলে, এখন সেই তুমিও আমার চোখের সামনে এমন করে পর্দা টেনে দিতে চাইছ কেন? যা সত্য, কেন তুমি তাকে আড়াল করে রাখতে চাইছ?

তার মানে? এসব বলছ কি তুমি? আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করল সুবিনয়।

ঠিকই বলছি। মরণদাকে তুমি তার মনের কথাগুলি খোলাখুলি প্রকাশ করতে দিলে না। যেই মাত্র তার চাপা দেওয়া কথাগুলি বেড়িয়ে পড়ল. অমনি কি এক ভয়ত্রস্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠলে তুমি![৩৩]

সুবিনয়ের অন্তরালে যে অবশিষ্ট 'হিন্দুমন' প্রচ্ছন্ন হয়েছিলো, আনিসের উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তার সারসত্যকেই কেবল তুলে ধরলেন না লেখক, একটা সমাধানপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গিকেও উপস্থাপন করলেন।

শ্রীপুরের পার্শ্ববর্তী জামালপুরের হাট, তার জনস্রোত; ঘাসির পুকুরপার গ্রাম ও তার অন্তর্বর্তী বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে "পদচিহ্ন" উপন্যাসের কাহিনী সুবিস্তৃত ও অধিকতর সমাজ-বাস্তবতাসংলগ্ন হয়েছে। শ্রীপুর যেমন ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজের সঙ্কট ও অবক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি, তেমনি জামালপুর বা ঘাসির পুকুর পার নব্য-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের অন্তর্গত মুসলিম জনশ্রেণীর সম্ভাবনা ও সীমা-বদ্ধতাকে ধারণ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের বিচিত্রমাত্রিক স্বরূপ সাত্তার-কাশেম প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে। সাত্তার যেমন আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তা-চেতনাসমৃদ্ধ প্রগতিশীল মুসলিম তারুণ্যের প্রতীক, তেমনি কাশেম নবগঠিত রাষ্ট্রীয় কাঠা-মোর নেতিবাচক প্রবণতাজাত অস্বাভাবিক ও বিকৃতভাবে বেড়ে-ওঠা

সঙ্কীর্ণচিত্ত সুবিধাভোগী মুসলিম জনশ্রেণীর প্রতিনিধি। লেখক উপন্যাসে সমান্তরালভাবে দু'টি শ্রেণীমানসকে বিন্যস্ত করেছেন। ব্যক্তির একান্ত সংবেদনময় অস্তিত্ব অনুভবে কখনো, কখনো-বা ইতিহাস-ঐতিহ্যের আলোকে জীবনচেতনার ইতিবাচক প্রেরণা-উৎস নির্দেশে, আবার কখনো কখনো মানুষের অন্তর-বাহিরের সঙ্কট ও দ্বন্দ্বজটিল জীবনসত্য প্রকাশে ঔপন্যাসিক নিরাসক্ত ও গভীর জীবনদৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন।

সংগ্রামী অসিত ঘোষ, অসহযোগ আন্দোলন, স্বাধীনতার জন্য তার অকুতোভয় সংগ্রাম প্রভৃতি আনন্দ ও আনন্দ আশ্রম প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। এই অতীত ঘটনার উপস্থাপনকে আরোপিত মনে হয় না কখনো, বরং শ্রীপুর গ্রামের বর্তমান অবস্থার রূপায়ণে তা অনিবার্য প্রসঙ্গে পরিণত হয়। ১৯২১ সাল ও তার অব্যবহিত পরবর্তী সময়-কালে বাংলাদেশের নিস্তরঙ্গ গ্রামসমূহ ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলমুক্তির প্রত্যাশা ও সাধনায় কিভাবে তরঙ্গিত হয়ে উঠেছিলো, অসিত ঘোষ প্রসঙ্গে তা-ই হয়ে উঠেছে ব্যঞ্জনাময়, জীবন্ত। সুভদ্রা দেবীর মধ্য দিয়ে নারীজাগরণের অগ্নিমন্ত্রই কেবল নয়—লেখকের বাস্তবতার অনুভবে রঞ্জিত কল্পনা একটা সর্বজনীন স্বভাবধর্ম অর্জন করেছে। অসিত ঘোষের সংগ্রামশীল জীবনের স্মৃতিকথায় স্বাভাবিকভাবেই সত্যেন সেনের নিরাসক্ত জীবন-দৃষ্টি ও অভিজ্ঞানমণ্ডিত রাজনৈতিক মতাদর্শ গান্ধীবাদ ও তার নেতি-বাচক স্বরূপসত্য নির্দেশে সক্ষম হয়েছে।

সুবিনয়ের বোন আরতির যে সঙ্কট তা-ঠিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, সামাজিক সঙ্কটেরই একটি গভীরতর রক্তক্ষত স্তর। তার শিক্ষা-দীক্ষা-অভিরুচির সাথে বর্তমান পারিপার্শ্বিকতার অসামঞ্জস্য এই রক্ত-ক্ষরণকে তীব্রতর করেছে। আরতির মধ্যে স্বপ্নকল্পনা থাকা স্বাভাবিক ও সঙ্গত, কিন্তু তা শ্রীপুরের সমাজব্যবস্থায় অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ও অন্তর্গত রক্তপাতকেই কেবল ত্বরান্বিত করবে।

ঘাসির পুকুরপার গ্রামের জীবনবিন্যাস শ্রীপুর থেকে স্বতন্ত্র। মুসলমান-অধ্যুষিত এই গ্রামের বহির্বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতা অঙ্কনে লেখকের অভিজ্ঞতার বিস্তার ও সূক্ষ্মতা গভীরতাস্পর্শী। দুইটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সমান্তরাল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সত্যেন সেনের অনাসক্ত নির্মোহ

জীবনদৃষ্টি বিস্ময়কর। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র নির্মাণই যেন তাঁর অন্বিষ্ট।

সান্তারের মধ্যে তারুণ্যের যে প্রকাশ, তা সাম্প্রদায়িকতা-অতিক্রান্ত জীবনচেতনায় উজ্জ্বল। মনের ঔদার্য ও প্রকৃতির শুশ্রূষায় তাদের অনুভবও লেখকের ইতিবাচক অন্বেষার প্রতিচিত্র :

> সকাল বেলার রোদটা একটু একটু উষ্ণ হয়ে উঠেছে। গ্রামের পথে শীতের সকাল, অপূর্ব তার মাদকতা। একটা বাঁশ বনের ধার দিয়ে ওরা যাচ্ছিল। রোদ পড়ে বাঁশের পাতা-গুলি চিকমিক করছে। একদল শালিক নাচানাচি মাতা-মাতি করছে, একটা খুঁটায় বাঁধা গরু ওদের দিকে ডাগর ডাগর চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। উপরে নীল আকাশ, ঘননীল, এক স্থির নীল সমুদ্র। ওরা সবাই স্বতন্ত্র, অথচ সব কিছু জড়িয়ে একটি অদৃশ্য ঐক্যসূত্র, অপূর্ব সামঞ্জস্য। সান্তার আর মোস্তাকের চোখের তারায় যেন তারই ছায়া প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। এর মাঝখানে মানুষের এই ভেদবিভেদ ওরা সইতে পারছে না।[৩৪]

ঘাসির পুকুরপার গ্রামের সমগ্রতা উন্মোচনে ব্যক্তি-অস্তিত্বের বৈচিত্র্য-মণ্ডিত স্বরূপসত্য কল্লোলিত হয়ে উঠেছে উপন্যাসে। বর্তমান পরিপার্শ্ব, তার অন্তর্বর্তী জনস্রোত, তাদের মনস্তত্ত্ব-অনুষঙ্গী অতীতকল্পনা উপন্যাসে প্রাণময় হয়ে উঠেছে। কাশেমের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণচেতা সাম্প্রদায়িক অস্তিত্ব সুস্পষ্ট, তার কারণ কাশেমের অর্ধশিক্ষা, খণ্ডিত অভিরুচি ও জীবনচেতনার গভীরে নিহিত। কোনো সমাজের অস্বাভাবিক বিকাশ ও স্ফীতি এ-জাতীয় ব্যক্তিসৃষ্টির নিয়ামক শক্তি। কিন্তু তার বৃদ্ধ পিতামহ আরবালি হাওলাদারের মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজের প্রতিনিধিত্বই কেবল সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না, তাঁর অতীতপ্রিয়তার নেপথ্যে খণ্ডিত, বিপন্ন বর্তমানের যন্ত্রণাবোধও সক্রিয় : 'আনিসের দিকে চোখ তুলে বুড়ো দাদু বললেন, কি দেখতে এলে ভাই? হিন্দুর শ্মশান আর মুসলমানের গোর-স্তান, এ যেন হয়েছে তাই।'[৩৫] শ্রীপুরের প্রাক্তন জমিদার চোধুরী বাবুদের তহশীলদার আরব আলির সেক্যুলার জীবনদৃষ্টির কারণ কেবল

অতীতপ্রীতি বা সামন্তমূল্যমানকেন্দ্রিক নয়, সাতচল্লিশ সালের ভারত-বিভাগের পরবর্তী সময়পরম্পরার রক্তাক্ত ও অমানবিক ঘটনাপ্রবাহের প্রতিক্রিয়াজাতও।

বর্তমান যখন কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রদানে ব্যর্থ হয়, তখনই মানুষের মধ্যে জাগে অতীতের প্রতি মোহমুগ্ধতা। আরবালি বা রহিম মণ্ডলের উক্তিতে সমাজ-অন্তরালবর্তী ব্যক্তিচৈতন্যের সে প্রকাশও কখনো কখনো সুস্পষ্ট। আবার নবগঠিত রাষ্ট্রের অসঙ্গত বিন্যাস ও তার অন্তর্বর্তী সঙ্কট চিত্রায়ণে একটি সম্মিলিত উচ্চারণকে নিপুণ কৌশলে বিন্যস্ত করেছেন লেখক:

> প্রজাদের উন্নতি! বিদ্রূপের হাসিতে ভরে গেল ঘরটা। এমন একটা হাসির কথা কেউ যেন আর শোনে নি। একজন মন্তব্য করল, উন্নতির মধ্যে এইতো দেখছি, আগে অন্তত দু'বেলা পেট ভরে খেতে পেতাম, এখন একবেলাও জোটে না।[৩৬]

কাশেমের ছোট চাচা কুদ্দুস মিঞা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। তাঁর মধ্যে একটা বিচক্ষণ মনোভাব যেমন বিদ্যমান, তেমনি, দীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক অপশাসনের বিকারজাত সংকীর্ণতাও অনুপস্থিত নয়। তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা দ্বন্দ্বময় বলেই নবগঠিত ভূখণ্ডের একাংশের যথার্থ মানসস্বরূপের পরিচয়বাহী। তাঁর উচ্চারণ থেকেই প্রথম শ্রীপুর গ্রামে আধুনিক বণিকশ্রেণীর উদ্ভবের কাহিনী সুস্পষ্ট হলো। সঙ্গতি-অসঙ্গতি মিলিয়ে যে মানবিক অস্তিত্ব, কুদ্দুস মিঞা যেন তারই প্রতিচ্ছবি। তাই আধুনিক চিন্তা-চেতনায় ঋদ্ধ নবযুগের প্রতিনিধি আনিস-সাত্তারকে গভীর মমতায় আকর্ষণ করেন তিনি।

স্বদেশবিতাড়িত পশ্চিম বঙ্গীয় মুসলমান খুরশেদ আলমের মধ্যে দিয়ে সমাজ-ইতিহাসের আরেকটি রক্তক্ষত দীর্ঘশ্বাস মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনের সীমাহীন সঙ্কট ও ভাঙা-গড়ার ইতি-বৃত্তের সাথে সমান্তরালভাবে উপস্থাপিত হয়েছে আশ্রয়দাতা নির্মল রায় ও তার পারিবারিক পরিচিতি। একটা অসঙ্গত রাজনৈতিক বিভাজনের মর্মন্তুদ প্রতিক্রিয়া কিভাবে মানুষকে স্ব-ভূমি ও আশৈশবলালিত প্রকৃতি-জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সীমাহীন শূন্যতার মধ্যে নিক্ষেপ করে, খুরশেদ

আলম এবং রায় বাবুদের জীবনকথায় তা-ই অভিব্যক্ত হয়েছে। নিজের স্মৃতিছিন্ন অতীতজীবন ও স্মৃতিবিজড়িত রায়বাড়ির সমগ্রতা সমাজ-বাস্তবতার এক বেদনাঘন অধ্যায়। বহু পুরুষের শ্রম ও সাধনায় নির্মিত ঐতিহ্যময় পারিবারিক জীবন কিভাবে একটা অসঙ্গত রাজ-নৈতিক মীমাংসার ফলে অবক্ষয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে, খুরশেদ আলম বা রায়বাবুদের বিপর্যস্ত সংসারের মধ্যদিয়ে সে-সত্যকেই উন্মোচন করেছেন লেখক। খুরশেদ আলমের বর্ণনায় সেই গার্হস্থ্যজীবনসত্য ও সেই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মর্মন্তুদ চিত্র প্রতিবিম্বিত। কলকাতার দাঙ্গা, বিভাগোত্তর কালের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, স্বদেশত্যাগী মানুষের বিপন্ন অর্থনৈতিক-পারিবারিক জীবন প্রভৃতি প্রসঙ্গ খুরশেদ আলমের জীবনকথায় সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে উপস্থাপন করেছেন লেখক।

সমাজদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীদ্বন্দ্বপীড়িত জনজীবনের মধ্য থেকে যারা নতুন সম্ভাবনার লক্ষ্যে উজ্জীবিত, সেই বিকাশমান শ্রেণীর প্রতিনিধি আনিস সুবিনয়, সাত্তার। হিন্দু বা মুসলমান নয়—একটা স্বতন্ত্র পরিচয়ে তারা উজ্জ্বল। সেই দ্বন্দ্বময় অথচ দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ হবার সম্ভাবনায় উদ্বেলিত শ্রেণীচরিত্রের স্বরূপ আনিসের উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে :

> ...আসল কথা কি জান, সুবিনয় হিন্দু আর আমি মুসলমান হলেও আমরা দু'জন অপর এক জাতের অন্তর্ভুক্ত। সেই জাতের নাম নিম্নমধ্যবিত্ত।
>
> ...সাত্তার সকৌতুকে প্রশ্ন করল, আর আমি? আমাকে কোন জাতের মধ্যে ফেলছেন?
>
> ফেলবার মালিক কি আর আমি? আনিস উত্তর দিল, পরিবেশ আর বৃত্তি ঠেলে নিয়ে চলেছে এ-জাত থেকে ও জাতে এ পংক্তি থেকে ও পংক্তিতে। তুমিও নিম্ন মধ্যবিত্তের দিকে পা বাড়িয়েছে। কিন্তু এখনও তোমার গায়ে মুসলমান কৃষকের গন্ধ লেগে রয়েছে। ...এই যে, আমি, সুবিনয় এবং আমাদের মত কেউ কেউ, এরা হচ্ছে নিম্ন মধ্যবিত্তের মধ্যে প্রগতিশীল নামক অংশ। আমরা আমাদের উপরতলার লোকদের বিরুদ্ধে

বিক্ষোভ প্রকাশ করি। আর আমাদের নীচে যারা আছে, তাদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে চাই। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই এই একাত্মতার জন্ম মস্তিষ্কে, তার শিকড় হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।[৩৭]

এই বিশ্লেষণ যে লেখকের সমাজ-অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানেরই মীমাংসা-জাত, তা বলাই বাহুল্য। সুবিনয়ের আত্মবিশ্লষণের মধ্যেই শ্রেণীদ্বন্দ্বের ইতিবাচক স্বরূপসত্য বিধৃত। মদন ঢালী ও তার পারিপার্শ্বিক জীবন বর্ণনায় লেখক সমাজের অন্যতর স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। যেখানে মানুষ হিন্দু-মুসলিম অতিক্রান্ত অন্য একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত----যা নির্ধারিত হয় কেবল অর্থনৈতিক অবস্থানের দ্বারা। রফিকের মধ্য দিয়ে গ্রামজীবনের প্রতি যে বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে---তা মূলত স্ব-সমাজের অস্বাভাবিক ও স্ফীতোদর সুবিধাভোগী শ্রেণীকে কেন্দ্র করেই। যাদের শ্রেণীচরিত্র ঠিক সাম্প্রদায়িকতার পর্যায়ভুক্ত নয়, কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক: 'ওয়াহেদ মল্লিক এতদিন হিন্দুদের সম্পত্তি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করেছে। আর আমাদের গ্রামের মুসলমান ভাইদের কেউ কেউ তার দালালী করেছে। ...কিন্তু ওয়াহেদ মোল্লা এ সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। হিন্দু আর মুসলমান খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই তার। হিন্দু ভাইদের সম্পর্কে যা করণীয় তা শেষ করে এখন তার মুসলমান ভাইদের পিছনে লেগেছে।'[৩৮] রফিকের উক্তিতে কৌতুকের মধ্য দিয়ে হলেও একটা শ্রেণীর স্বরূপ সুস্পষ্ট।

আনিসের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, শ্রুত কাহিনীমালা---যামিনী মিত্র, সুবিনয়, আরবালি হাওলাদার, কুদ্দুস মিঞা, খুরশেদ আলম-বর্ণিত অতীত বর্তমান এবং সর্বোপরি লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টির অনাসক্ত প্রয়োগে "পদচিহ্ন" উপন্যাসে বিন্যস্ত জীবন একটা সময়কালের সমগ্র বাংলাদেশেরই যেন প্রতিবিম্ব। আনিস অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনের নব উল্লাসে সেজন্যেই উচ্চারণ করে: 'এর মধ্যদিয়ে সারা দেশ যেন পরিক্রমা করে এলাম। শুধু দেশ নয়, একটা বিরাট যুগকেও যেন অতিক্রম করে এলাম। কত মানুষ, কত ঘটনা, কত ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস!'[৩৯] এবং আনিসের উচ্চারণে যেন লেখক নিজের দৃষ্টিকোণকেই প্রতিফলিত করেছেন:

আমি অনেকটা Open mind নিয়ে এসেছিলাম। কাজেই পা হড়কে গিয়ে একেবারে হাড়গোড় ভেঙ্গে যায়নি। বিস্মিত হয়েছি, চমকিত হয়েছি, দুঃখিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, নতুন জিনিস দেখেছি, পুরোনো জিনিসকে নতুন করে দেখতে শিখেছি।[৪০]...

উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে যামিনী মিত্র, প্রমীলা ও আরতির দৃষ্টিকোণের সমান্তরাল ব্যবহার লেখকের শিল্পবোধের গৌরবকেই প্রতিবিম্বিত করে। আরতির মনস্তত্ত্ব কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হলেও অসঙ্গত নয়। কেননা, 'আরতির জীবনে এ ধরনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম।' সে অভিজ্ঞতা আসলে আনিসের মতো উদার-সংস্কারমুক্ত আধুনিক তরুণের সংস্পর্শ। আরতির মনোজগতের এই টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে। 'খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে রইল আরতি।' আনিস চলে যাচ্ছে শ্রীপুর গ্রাম থেকে, সুবিনয়ও চলে যাচ্ছে--- কিন্তু সুবিনয়ের মতো আনিস আর হয়তো ফিরে আসবে না। যামিনী মিত্রের পারিবারিক একাকিত্ব আর আরতির অসহায় নৈঃসঙ্গ্যের উন্মোচনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি-ঘোষণা সমাজ, সময় ও ও মানবজীবন সত্যের গভীরতর স্তরস্পর্শী।

"পদচিহ্ন" উপন্যাস বিষয় গৌরবে অনবদ্য হলেও প্রকরণের প্রশ্নে ত্রুটিমুক্ত নয়। বরং একাধিক অসঙ্গতি এ-উপন্যাসে সুস্পষ্ট। যেমন কখনো কখনো মনে হবে নিছক বর্ণনাদানই লেখকের অন্বিষ্ট। ভাষাবিন্যাসের ক্ষেত্রেও দেখা যায় চরিত্রানুগ সংলাপ ও শব্দবিন্যাস প্রায়শ অনুপস্থিত। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা ও চলমান জীবনের উন্মোচনে লেখকের পর্যবেক্ষণ যে অনুভাসঞ্চারী, তার একাধিক দৃষ্টান্ত এ-উপন্যাসে লভ্য। যেমন:

এক. ন্যাড়া মাথা বাচ্চা দু'টো ইতিমধ্যে ওদের পরীক্ষা করা শেষ করে একটা মুরগীর পিছনে ছুটছে। উঠানের ওধারে একটা কুল গাছে বিস্তর কুল ধরেছে। কুলে সবেমাত্র পাকন লেগেছে। কুল গাছের তলায় একটি বারো-তেরো বছরের মেয়ে উর্ধ্বদৃষ্টি হয়ে সুর করে ছড়া কাটছে। হঠাৎ ওদের দিকে দৃষ্টি পড়ায় মেয়েটা জিভ কাটল। সুবিনয় বলল, আমরা মত্ত গজের মত তপোবনের শান্তি ভঙ্গ করে চলেছি।[৪১]

দুই. মাঠের মাঝখান দিয়ে সরু পথ, পথের দুধারে সরষে ক্ষেত। হলদে রঙের ফলগুলিতে ছেয়ে আছে সারা মাঠটা। আর সেই হলদে রঙের ফাঁকে ফাঁকে সাদা ধবধবে বকগুলি লম্বা লম্বা গলা বাড়িয়ে খাদ্য খুঁজে খুঁজে ফিরছে। মাঠের পর মাঠ, তারও পরে মাঠ দিগন্ত রেখায় গিয়ে মিশেছে। সরষে ফুলগুলিকে কেন্দ্র করে পতঙ্গদের মৃদু গুঞ্জরণ, আর কোন শব্দ নেই।[৪২]

"পদচিহ্ন" উপন্যাসের ভাষা যে সর্বাংশে অলঙ্কারবর্জিত, তা বলা যাবে না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাষাবিন্যাস বর্ণনাধর্মী। তবে দু'একটি উপমানচিত্রে সুগভীর অর্ন্তদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় বিধৃত:

১. সেই এককালের জমজমাট দারোগা বাড়ীতে এখন শিবরাত্রির সলতের মত টিম টিম করে জ্বলছে যামিনী মিত্রের সংসার।[৪৩]

২. বর্ষণশেষের পাতলা রোদের মত দিদির ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে উঠল।[৪৪]

৩. চাঁদের টানে উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের মত ওর মনটা কানায় কানায় ভরে উঠল।[৪৫]

প্রথম উপমায় যামিনী মিত্রের জীবনসমগ্রতা বোঝানোর উপযোগী অনিবার্য অনুষঙ্গবাহী চিত্র বিন্যস্ত হয়েছে, দ্বিতীয় উপমায় আনন্দ চৌধুরীর দিদি সুভদ্রা দেবীর অভিব্যক্তি লাভ করেছে অনবদ্য প্রকাশরূপ; এবং তৃতীয় উপমায় অভিজ্ঞতাঋদ্ধ ও নিসর্গমুগ্ধ আনিসের মানসিকতার স্বরূপ হয়ে উঠেছে ব্যঞ্জনাময়।

পাঁচ

সত্যেন সেনের জীবনাভিজ্ঞতার এক নতুন প্রান্ত উন্মোচিত হয়েছে "সেয়ানা"[৪৬] উপন্যাসে। এই অভিজ্ঞতা ঠিক অধীত গ্রন্থজগৎ বা নিজ জীবনসম্পৃক্ত নয়----মানবচরিত্র অনুধ্যানের ঐকান্তিকতাজাত। সুদীর্ঘ কারাবাস কালে যে বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে তাঁকে যেতে হয়েছে, তারই বিশেষ একটি চরিত্রকে বিষয়বস্তু করে এ-উপন্যাস রচিত।

'বইখানি বিচিত্র, কেননা তার বিষয়বস্তু একরূপ অপ্রত্যাশিতই। মধ্য-বিত্ত পাঠকের কাছে আর লেখকের কাছ থেকে।'[৪৭] কিন্তু আমাদের সমাজের অন্তরালে আরেকটা জীবনপ্রবাহ যে এমন সমগ্রতা নিয়ে বিদ্যমান, তা ইতঃপূর্বে সাহিত্যের উপজীব্য হলেও "সেয়ানা"র বিষয় স্বতন্ত্র। এ-উপন্যাসে 'under world-এর বিশেষ একটি দিকের মর্মস্পর্শী এক জীবনকাহিনী'[৪৮] বিন্যস্ত হয়েছে। এই জীবন হচ্ছে পকেট মারদের। জীবনের ইতিবাচক মূল্যমানসন্ধানী একজন ঔপন্যাসিকের কাছে এই বিশেষ জীবন শিল্প-অবলম্বনের বিষয় হিসেবে কেন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো, উপন্যাস-বিবেচনায় তার স্বরূপনির্দেশ স্বাভাবিকভাবেই প্রাসঙ্গিক।

মনোজ বসুর "নিশিকুটুম্ব"[৪৯] উপন্যাস সম্ভবত বাংলা ভাষায় প্রথম এ-জাতীয় সার্থক সাহিত্য প্রয়াস। কিন্তু সে উপন্যাসের বিষয় 'চোর্যবৃত্তির প্রাচীন বাস্তবসম্মত ও ভাবাদর্শমূলক কাহিনী। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে চোর্যক্রিয়ারও যে একটা বিধিনিষেধসমন্বিত নীতিনির্দেশ, দেহমনের সাধনপ্রস্তুতি ও শিল্পোৎকর্ষ ছিল এই উপন্যাসে তাহারই একটি রোম্যান্স রমণীয় চিত্র আঁকারই প্রয়াস দেখা যায়।'[৫০] "সেয়ানা" উপন্যাসে ঝড়ু বা তার পারিপার্শ্বিকতা, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে লেখকের অন্বিষ্ট সম-কালীন জীবন ও তার বিকারজাত চরিত্রপুঞ্জ ও তার গতিবিধি। এদিক থেকে বরং ভিক্টর হুগোর "লা মেজারেবল্" এর সাথেই "সেয়ানা" উপন্যাসের কিছুটা বিষয়গত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু জাঁ-ভাল-জাঁ-র সমস্যা যেখানে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক, ঝড়ুর সমস্যা সেখানে প্রথমত ব্যক্তিগত এবং ক্রমান্বয়ে সামাজিক। "নিশিকুটুম্ব"-এর জীবন পাঠকের মধ্যে ঘৃণা, বিতৃষ্ণা বা বাস্তবজীবনদর্শনকে জাগ্রত করে না, কিন্তু "সেয়ানা"র বিষয় ও জীবনকল্পনা তার সমগ্রতা নিয়েও পাঠকের মধ্যে জীবনসম্পর্কে একটা মীমাংসায় উপনীত হতে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে, জাঁ-ভাল-জাঁ-র জীবন ও সঙ্কটের মধ্যে যে নির্বিশেষে মানবিকতা বিধৃত, তা এক ধরনের সম্মোহন বা বেদনাবোধকেই জাগ্রত করে পাঠক হৃদয়ে। ঝড়ু আমাদের সমান্তরাল জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ হওয়া সত্ত্বেও কোনো আকর্ষণ বা মানবিক সংবেদনাকে জাগ্রত করে না। একটা বিকারগ্রস্ত সমাজের নেতিবাচক সক্রিয়তার স্বরূপনির্দেশই যেন "সেয়ানা" উপন্যাসের অন্বিষ্ট। এ-জাতীয় বিষয়সম্বলিত উপন্যাস রচনার উপাদান যে পূর্ব থেকেই সত্যেন সেনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিলো, "রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ"

উপন্যাসের চরিত্রপ্রবাহ তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু "সেয়ানা'য় যে-জীবন তার সমগ্রতা নিয়ে উপস্থিত, লেখকের সূক্ষ্ম সমাজদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়ই সেখানে মুখ্য। 'সূর্যের আলো পড়ে যেমন প্রাসাদে ও পুষ্পমালঞ্চে তেমনি তা ক্লেদে ও পঙ্কে, উদ্‌ঘাটিত করে সব—ধিক্কার দেবে বলেই অস্থানে এসে পড়ে না। কী মন্ত্রে জানিনে পরিণামে শুদ্ধ করে, পবিত্র করে। কবি বা আর্টিস্টের কল্পনাও তেমনি। সেই জ্ঞান ও কল্পনাযোগে সত্যেন সেন যেমন পটেকমার ঝড়ু-নাসিমকে দেখেছেন, তেমনি বেশ্যাপল্লীর দেহব্যবসায়িনী নানা অবস্থায় নানান মেয়েদের, যাদের দুঃখ দুর্গতি পাপ অথবা লজ্জা, শারীরিক ও আত্মিক সে কেবল তাদের নয়, সমাজেরই—আমার, তোমার, তার।... তাঁর বইয়ের পৃষ্ঠা থেকেই এসব কথা স্বপ্রতিভাত হয়েছে। ...সমাজের যেখানে সেখানে পচা ঘা, গলিত কুষ্ঠ বা ক্যান্সার, সেখানেই সচেতন শিল্পীর দৃষ্টি—ঐ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন কোনোরূপ বিলাস কিম্বা ব্যসনহেতু নয়, মানুষের প্রতি মানুষোচিত ভালোবাসা আছে বলেই। সে মানুষ আছে জাতি ধর্ম শ্রেণী অবস্থা-নির্বিশেষে সব মানুষের ভিতরেই।'[৫১] শিল্পীর নিরাসক্ত মন নিয়ে মানুষকে অবলোকন করার ফলে এক অনুদ্‌ঘাটিত জীবনের সম্পূর্ণ চিত্রই যেন শব্দরূপ পেয়েছে "সেয়ানা" উপন্যাসে। শিল্পী যখন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য-অতিক্রান্ত বিষয়কে শিল্পের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেন, তখন তাঁর ভাষা বা প্রকরণেও অন্বিষ্ট জীবনবাস্তবতা-অনুষঙ্গী স্বভাববৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হতে বাধ্য।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঝড়ু "নিশিকুটুম্ব"-এর সাহেব-এর মতো জৈবনিক অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে চৌর্যবৃত্তির মধ্যে সমস্ত সক্রিয়তা প্রয়োগ করেনি; বরং তার বন্ধনভীরু মন পারিবারিক-সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্তি সন্ধান করতে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ক্লেদ-গ্লানিজর্জর অব্যবস্থিত সমাজ প্রেক্ষাপটে। ঝড়ুর জন্ম ও মানসিকতার স্বরূপ ঔপন্যাসিক বিবৃত করেছেন এভাবে :

> এক ঝড়ের রাতে ওর জন্ম। সেইজন্যই ওর দাদী ওর নাম রেখেছিল ঝড়ু। পরে যথারীতি নাম রাখা হয়েছিল ফিরোজ। কিন্তু রাজকীয় নামটা পাট করা সৌখিন কাপড়ের মত বাক্সেই আটকা রয়ে গেল। তার ব্যবহার খুব কমই হয়েছে। ঝড়ু ঝড়ুই থেকে গেল।

যে দুর্যোগের মধ্যে ওর জন্ম হয়েছিল, সেই দুর্যোগ ওর আজও কাটল না। যে ঝড় একদিন, কে জানে কোথা থেকে ওকে এই দুনিয়ার বুকে উড়িয়ে এনে ফেলেছিল, বুঝি সেই ঝড়ের ঝাপটা খেয়ে ও দেশে দেশে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওর ট্রেনটা স্টেশনে দাঁড়ায় বটে, কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে পারে না। তাই ওর আজও কোন স্থিতি হলো না। ঝড়ের সন্তান ঝড়ু স্থিতির কথা ভাবতে পারে না। এক জায়গায় দু'দণ্ড বসলেই ওর মন কেবল উড়ু উড়ু করতে থাকে।[৫২]

জন্ম-বোহেমীয়ান ঝড়ুর জীবনের নেতিবাচক গতিবিধিকে লেখক কার্য-কারণহীন বলে চিহ্নিত করেন নি। এই কার্যকারণসূত্রের প্রথম ও প্রধান নিয়ন্তা মিঠুয়া। পারিবারিক বন্ধন ও উঠতি বাঙালি মুসলমান মধ্য-বিত্তের নিষ্ঠা ও শ্রমের জীবন ঝড়ুর মানসিকতায় প্রবল বিতৃষ্ণা-ই জাগ্রত করেছে। এই বিপরীত মনোভাবের যথার্থ পরিচর্যার বদলে সে আঘাত, লাঞ্ছনা পেয়েছে পরিবার থেকে, শিক্ষাঙ্গন থেকে। ফলে প্রতিবেশী মিঠুয়ার কাছেই সে সহায়তা প্রার্থনা করলো। তার কৃত্রিম বাহ্যিকতায় মোহাচ্ছান্ন ঝড়ু এক বন্ধনহীন স্বপ্নময় জীবনের প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। কিন্তু মিঠুয়া যে-জীবনের মধ্যে নিক্ষেপ করলো ঝড়ুকে—নতুন পরিচয়ের আকস্মিকতায় সে-জীবন অসম্ভব মনে হলেও তার অনিবার্য রাহুগ্রাস থেকে মুক্তির কোনো উপায় ছিলো না।

মাত্র দশ বছর বয়সে রংপুর জেলার গ্রামাঞ্চলের অবস্থাপন্ন একান্ন-বর্তী মা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন পরিবৃত সংসার ছেড়ে বন্ধনহীন নিরবচ্ছিন্ন জীবনের প্রত্যাশায় ঝড়ু মিঠুয়ার সাথে গৃহত্যাগ করে। কিন্তু পকেটমার মিঠুয়া ব্যবসা-উন্নত-স্বাধীন জীবনের পরিবর্তে তাকে যে-জীবনের সন্ধান দিলো, তা ছিলো একান্তই অপ্রত্যাশিত। মিঠুয়ার প্ররোচনায় ভাইয়ের দোকানের ক্যাশ-বাক্স থেকে টাকা চুরি করে নেবার ফলে তৎক্ষণাৎ গৃহে ফেরার কথাও তার পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিলো না। এভাবেই একটা অনিবার্য বাধা ঝড়ুর গৃহ-প্রত্যাবর্তনের পথকে রুদ্ধ করে দেয়। এর পরেও যে নৈতিক বাধা অর্থ-আয়ের পন্থা অবলম্বনে ঝড়ুর চিত্তকে প্রথম পর্যায়ে সংশয়িত করেছে, নিজের শেষ সম্বল দু'শো টাকা সমেত ব্যাগ ঘুমন্ত অবস্থায় অপহৃত হবার পর জীবনের প্রয়োজনেই

তাকে নীতিবোধের শেষ সূত্রটাকে ছিন্ন করতে হয়। ঝড়ুর এ-অবস্থার মানসিক চিত্রটি উল্লেখযোগ্য:

> হাত পা এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরা যে যাই করুক বা না করুক, মাথা কিন্তু তার কাজ ঠিকই করে চলেছে। হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুদ্দীপ্তির মত তার মনের আকাশে ঝলসে উঠতেই সে বিষম চমকে উঠল। কাল সকালে মিঠু ভাই চলে গেল, আর সেই রাত্রিতে তার ব্যাগ উধাও। এই দুটো ঘটনার মধ্যে কোন রকম যোগাযোগ নেই তো?...
>
> পকেটে মাত্র চার আনা পয়সা বাকী আছে। পয়সায় টান পড়তেই ক্ষিদেটাও যেন চতুর্গুণ বেড়ে উঠেছে। টাকা যা ছিল সব তো গেছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার।[৫৩]

এই মানসিক অব্যবস্থার মধ্যেও ঝড়ু প্রথম পর্যায়ে সৎ পন্থাকেই অবলম্বন করতে চেয়েছে বেঁচে থাকার জন্য। খবরের কাগজের হকার হতে চেয়েছে সে, কিন্তু সহায়তা পায়নি। অতঃপর রামপ্রসাদ কুরমির কাছ থেকে যে জীবনের পরিচয় যে পেলো, তার মধ্যেও ছিলো না কোনো নিশ্চয়তা, একটা ভাসমান অনিশ্চিত ভবিষ্যৎই সেখানে প্রবল হয়ে উঠলো। সমাজে মিঠুয়াদের সাহচর্য পাওয়া সম্ভব, কিন্তু সুস্থ জীবনের সন্ধান দানকারী মানুষের সংখ্যা সেখানে অল্প। অতঃপর মিঠুয়ার আগমন এবং ঘৃণ্য পকেটমারের জীবনধারাই হলো ঝড়ুর অবলম্বন। কলকাতা শহরের উদাসীন ও ব্যস্ত মানবকল্লোলে অসহায় ঝড়ু সীমাহীন যন্ত্রণা ও আত্মরক্তক্ষরণ শেষে মিঠুয়ার জীবনপ্রক্রিয়ারই অনুসারী হয়ে উঠলো।

এভাবেই ঝড়ু 'নিজগুণে' সেয়ানা হিসেবে দ্রুত উন্নতি' অর্জন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু সেয়ানাবৃত্তি ঝড়ুর জীবনধারার প্রধান প্রান্ত হলেও অন্যান্যদের থেকে সে স্বতন্ত্র। জৈবনিক গতিবিধি, অভিজ্ঞতার বিস্তার ও অনুভবের স্বাতন্ত্র্যে তার মধ্যে লেখক জীবনের সমগ্রতাকেই যেন প্রতিবিম্বিত করেছেন। অবশ্য এই সমগ্রতা মানবজীবনের এক অনুদ্‌ঘাটিত প্রান্তকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। পূর্ণাঙ্গ হয়ে-ওঠা সেয়ানা ঝড়ুর চিত্তবৃত্তির সংবেদনময় উপস্থিতিও এ-উপন্যাসে একাধিকবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যেমন, চলমান ট্রেনে বসে তার অনুভবের অন্যতর অভিব্যক্তি:

> মাঝে মাঝে হঠাৎ যে কেমন অস্থির হয়ে ওঠে মনটা। তখন ঝড়ু এমনি করে বেরিয়ে পড়ে। কিছুতেই চুপ করে বসে থাকতে পারে না। জন্ম লগ্নে যেই ঝড়ের ঝাপটা ওর গায়ে লেগেছিল, তা ওকে শান্ত হয়ে থাকতে দেয় না। কিছুদিন যাবৎ কি যে হয়েছে ওর! মাঝে মাঝে বড় একা একা মনে হয়। আগে তো এমন ছিল না।[৫৪]

যে-বন্ধনহীন জীবন ছিলো ঝড়ুর একান্ত কাম্য, তার উদ্দামতা ও গতি-চাঞ্চল্যের মধ্যেও সে মাঝে মধ্যে আত্মমগ্ন এক স্বতন্ত্র জগতে প্রবেশ করেছে।

ঝড়ু প্রথমবার ধৃত হয় সান্তাহার স্টেশনে, কিন্তু এক উদারচিত্ত সরল যুবকের হস্তক্ষেপে সে মুক্তি পায়। যুবকটি তাকে সুস্থ জীবন-অবলম্বনে উৎসাহিত করলেও ঝড়ু-তা গ্রহণ করেনি। দ্বিতীয়বার দর্শনা স্টেশনে ধরা পড়ার পর আসামী হিসেবে নিজগুণেই সে রক্ষা পায়। 'এর পরও আরও দুবার তাকে ধরা পড়তে হয়েছে। সেই উপলক্ষে প্রথমবার চার মাস আর দ্বিতীয়বার ছ'মাস জেল খাটতে হোল। সে জন্য কোন আফ-শোষ করতে হয়নি তার। জেলখানাটা একটা দেখবার মত জায়গাই বটে। কত জায়গার কত নামী দামী ওস্তাদ এক জায়গায় এসে জড় হয়েছে। এ একটা তীর্থস্থান। ওখানে যে না এসেছে একদিক দিয়ে সে নাবালকই থেকে গেল।'[৫৫] ঝড়ুর অভিজ্ঞতার এই বিস্তার ক্রমাগত ব্যাপক হতে থাকে।

একবার চলমান ট্রেনে বসে ঝড়ু নিজের নৈঃসঙ্গ্যকে উপলব্ধি করেছিলো, আর একবার তার মানবিক সংবেদনশীলতা লোভ থেকে আত্মসংবরণে সহায়তা করেছে তাকে। এক দম্পতির সুন্দর শিশু সন্তানকে আয়ত্ত্বের মধ্যে পেয়েও, তার গলার সোনার লকেটটিকে সে হস্তগত করেনি। পক্ষান্তরে, তার মধ্যে এক চিরায়ত বোধ জেগে ওঠে, যা কেবল ঝড়ুর ক্ষেত্রেই সম্ভব। শিশুর মা যখন ঝড়ুর কাছে তার সন্তানকে রেখে বাথরুমে চলে যায়, সে-সময়কালীন ঝড়ুর মনস্তত্ত্ব:

> বাচ্চাটা দু হাত দিয়ে ওর গলাটা আঁকড়ে ধরেছে। ওর মাথাটা ঝড়ুর কাঁধের উপর। মাখনের মত নরম তুলতুলে শরীরটা

কেমন করে তার গায়ের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। কিন্তু ওর জামার নীচে শক্তমত কি ওটা তার বুকের উপর বিঁধছে। গায়ের জামাটা সরিয়ে যা দেখল ঝড়ু, তাতে ওর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠল। ওর গলায় একটা সোনার লকেট ঝুলছে। বেশ ভারী লকেট, অনেকটা সোনা আছে। ওর মা চোখমুখ ধুয়ে ফিরে আসবার আগে ওটা খসিয়ে নিলেই হয়। কোন হাংগামা নেই, ধরা পড়বার কোন ভয় নেই। এদিকে ট্রেনটার স্পীডও ক্রমেই কমে আসছে, সামনেই কোন স্টেশন আছে।... কিন্তু কে বলবে কেন, কিছুতেই তার হাত উঠতে চায় না। বাচ্চাটা পরম নিশ্চিন্তে ঝড়ুর গায়ে গা ছেড়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছে আর এদিকে ঝড়ুর বুকের মধ্যে অস্থির দাপাদাপি চলছে। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কয়কবারই সে হাত তুলল, কিন্তু হাত ফিরে আসে।[৫৬]

বাচ্চাটাকে মায়ের কোলে অর্পণ করে এক অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পায় ঝড়ু। মায়ের কোলে শিশুর হাসি এবং মায়ের হাস্যমণ্ডিত অভিব্যক্তি দেখে তার মনে হয় 'অবিকল এই রকম হাসি সে তার মায়ের মুখেই দেখেছে।'

সেয়ানাদের জীবন অন্যধারায় প্রবাহিত হলেও সামগ্রিক সমাজপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ১৩৫০--এর মন্বন্তরে তাই বাংলার বিপর্যস্ত আর্থ-সামাজিক অবস্থা সেয়ানাদের জীবনধারাকেও প্রভাবিত করে। উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ে সত্যেন সেন এ-অবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থাপন করেছেন। মন্বন্তরের ফলে 'বাংলার সমাজ ভেঙে চুরচুর হয়ে পড়তে লাগল। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ভেঙে চুরে খান খান হয়ে গেছে। যার যার পুরানো পেশাকে আঁকড়ে ধরে কেউ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। যুদ্ধের কন্ট্রাক্টরী, চোরাকারবারী, মজুতদারী আর মেয়ের ব্যবসা ছাড়া সব ব্যবসাই অচল। চোর ডাকাতেরা পর্যন্ত থ' খেয়ে গিয়েছে। সমাজের উন্নতিতে তাদের উন্নতি, সমাজের পতনে তাদের পতন। সেয়ানাদের মধ্যেও তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে।' লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ এভাবেই সামাজিক বাস্তবতার সামগ্রিক পটভূমিতে ব্যক্তি বা বিশেষ গোষ্ঠীর জীবনধারাকে অবলোকন করেছে। ঝড়ুর ব্যক্তিজীবনের অনুষঙ্গে সত্যেন সেন একটা সময়ের জীবনধারাকেই যেন পর্যবেক্ষণ করেছেন উপন্যাসে।

বাংলার সমাজের বিপর্যস্ত স্বরূপ ঝড়ুর মধ্যে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তার 'খোলা মেলা আকাশের নীচে নির্ভাবনায় ছুটে চলা চঞ্চল জীবন' নতুনের সন্ধানে অস্থির হয়ে ওঠে। ফলে, আসামে গিয়ে শুরু হয় তার নতুন জীবনধারা। সেয়ানাবৃত্তির পরিবর্তে সে যুদ্ধকালীন বিজাতীয় সৈনিকের সান্নিধ্যে গিয়ে অর্থ-আয়ের অন্য সূত্রের সন্ধান পায়। এযাবৎ মিঠুয়ার সাথে তার কিছুটা সম্পর্ক থাকলেও, তা ছিন্ন হয়ে যায় চিরতরে। পতিতা পল্লী থেকে মিলিটারিদের জন্য মেয়ের যোগান দিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে সে, এভাবেই ঝড়ুর অভিজ্ঞতায় জীবনের আরেকটা দিক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ-ক্ষেত্রেও প্রথম পর্যায়ে নীতি-বোধ তাকে পীড়িত করে; কিন্তু সংশয় থেকে উত্তরণ ঘটতেও বেগ পেতে হয় না :

> পঁচিশ টাকা! এতটা সে কিছুতেই প্রত্যাশা করতে পারেনি। এ যেন পাটের দালালী, পাটচাষীর সঙ্গে সমান সমান বখরা, যে চাষী গায়ের রক্ত জল করে পাট জন্মায়। হঠাৎ ওর মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠল সেই হৃষ্টপুষ্ট মেয়েটা কেমন করে নেতিয়ে পড়ে আছে। সমস্ত দেহটা নিংড়ে সে তার জীবিকা অর্জন করেছে। আর তারই মধ্যে ভাগ বসিয়েছে সে। বড় ছোট মনে হয় নিজেকে। এর চেয়ে পকেট মারের কাজ অনেক গৌরবের, তাতে বাহাদুরী আছে।....কিন্তু এ চিন্তা মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণেই তার মনটা আগেকার মতই ঝরঝরে হয়ে উঠল। টাকা টাকাই, যে পথ দিয়েই আসুক না কেন, তাতে তার বাজার দর কিছুই কমে না।[৫৭]

মিলিটারিদের সংস্পর্শে গিয়ে ঝড়ুর অর্থ-আয়ের পন্থাই কেবল পরিবর্তিত হলো না, তার অভিজ্ঞতা ও জীবনের ধারাও অন্য খাতে প্রবাহিত হলো। এখান থেকেই সে নারীর সাহচর্যের আনন্দ প্রথম উপলব্ধি করে। মিঠুয়ার স্ত্রী সখিনার মধ্যে সে দেখেছিলো নারীর মানসিক রূপ, কিন্তু পতিতা পল্লীর নারীর দেহজীবীনী পদ্মিনীর মধ্যে সে প্রথম নারীর দেহগত রূপের পরিচয় পেয়ে জীবনের এক অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতায় নবজন্ম লাভ করলো। 'পদ্মিনী যেন তাকে শিশুর মত বুকে করে জীবনের এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে এনে পৌঁছে দিয়েছে। অদ্ভুত মেয়ে

পদ্‌মিনী।'[৫৮] কিন্তু পদ্‌মিনীও তার জীবনে স্থায়ী হলো না। তার মানসিক আশ্রয়ের অবলম্বন পুনরায় ছিন্ন হয়ে গেল। সুতরাং পদ্‌মিনীহীন গৌহাটির মানসিক যন্ত্রণা ও আত্মরক্ষণ থেকে মুক্তি লাভের জন্যই ঝড়ু পুনরায় জীবনের নোঙর তুলে নতুনের আভযাত্রী হলো।

দশ বছর পর ঝড়ু নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করলেও, সময়ের ব্যবধানজনিত প্রাচীর অতিক্রম করে ঐকান্তিক হতে পারলে না গৃহগত জীবনের সাথে। এ-ক্ষেত্রে ঝড়ুর মানসিকতার স্বরূপ তার জীবনপ্রকিয়ারই সমধর্মী:

> মায়ের আদর, ভাই আর ভাবীদের ভালবাসা, ভাইপো ভাইঝীদের কলকাকলি, সকলের এত আদর আপ্যায়ন, সবকিছুর মধ্যে একটা নতুনত্বের আস্বাদ আছে, অহমিকার চরিতার্থতাও আছে। কিন্তু এভাবে গ্রামের এই ঢিমে-তালা জীবনে ক'দিন আর এক জায়গায় বসে থাকা যায়।...এখানে স্নেহ আছে। ভালবাসা আছে, মায়া আছে, কিন্তু সেই গতিও নেই, উদ্দামতাও নেই।
>
> আবার পথিক তার যাত্রা শুরু করল। প্রথম কয়েকটা দিন কেমন যেন লাগতে লগেল। প্রথম যখন সেয়ানার কাজে নেমেছিল, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিতান্ত দায়ে পড়েই নেমেছিল। সে জানত চুরী করা পাপ। ছোট ছেলেটার নীতিজ্ঞানে বড় বাধত তাই সব সাধ কাটিয়ে উঠতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল।[৫৯]

বাড়ি থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ঝড়ুর জীবনে অভিজ্ঞতার যে প্রান্ত উন্মোচিত হলো, তা এযাবৎকালের বন্ধনভীরু, বহির্মুখী ঝড়ুর জন্য সত্যিই বিস্ময়কর। খ্রীস্টান যুবক পিটারের সাথে তার পরিচয়, সেয়ানাবৃত্তির নতুন পটভূমি এবং পিটারের বোন লুসীর সাথে সম্পর্ক তার জীবনে একটা গৃহগত স্থিতির দ্বার খুলে দয়। লুসীকে বিয়ে করে জীবনের স্থিতি ও শান্তি তার কাম্য হয়ে ওঠে। একটা সুস্থ জীবন, স্ত্রী-সন্তানপরিবৃত সংসার। কিন্তু তা কেবল প্রত্যাশাই হয়ে থাকে তার জীবনে। একজনের পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়ে এক বছরের শাস্তি হলো ঝড়ুর। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাসায় গিয়ে সে জানতে পারলো 'লুসী সন্তান প্রসবের সময় মারা গিয়েছে। ছেলেটিও মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই

গেছে।' ঝড়ুর উদ্দাম বন্ধনহীন গতিময় জীবনের আশ্রয়-উৎস এ-ভাবেই পুনরায় একটা বেদনাময় রক্তাক্ত ছেদরেখা টেনে ছিলো তার জীবনে।

> ঝড়ু আর কোন দিন এভাবে মৃত্যুকে মোকাবেলা করেনি। এ তার এক নতুন অভিজ্ঞতা। জীবন থেকে একেবারে সরে যাওয়া আর মরে যাওয়া, এর মধ্যে তফাৎ আছে কিছু? পদ্মিনীকে হারিয়ে তার মন ভেঙে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল সংসার যেন শূন্য হয়ে গিয়েছে। কিন্তু লুসীর ব্যাপারটা যেন আলাদা। লুসী তো শুধু তার বউ নয়, তার সন্তানের জননী, যে সন্তান শুধু একদিনের পরমায়ু নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিল। তার মনে একটা প্রবল কৌতূহল জেগে উঠেছিল, ছেলেটা দেখতে কেমন হয়েছিল? কিন্তু কথাটা সে কিছুতেই জিজ্ঞেস করে উঠতে পারলো না।[৬০]

ঝড়ুর জীবন ও মানসবিবর্তনের রূপালেখ্য সত্যেন সেন "সেয়ানা" উপন্যাসে সুদক্ষভাবে বিন্যস্ত করেছেন। সর্বজ্ঞ লেখকের প্রসারিত ও সর্ববিস্তারী দৃষ্টি বিষয়ের অন্তর্গত-বহির্গত উভয় স্বরূপকেই গভীর-ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। লুসীর মৃত্যুর পর 'আবার সেই বন্ধনহীন দিক্‌বিদিকে ছুটে চলা' ঝড়ুর জীবনধর্ম হয়ে ওঠে। বাড়ির সাথে সে সংযোগ রাখে, কিন্তু দূরত্বটা আর অপসারিত হয় না। লুসী এবং তার প্রত্যাশিত সন্তান যে ঝড়ুর জীবনের বন্ধনকে স্থায়িত্ব দান করতো, সে অনুভবও কখনো কখনো স্পন্দিত হয়ে ওঠে তার মধ্যে। 'লুসী মেয়েটা নরম সরম হলে কি হয়, আস্তে আস্তে কেমন করে যেন তাকে গ্রাস করে ফেলছিল। এর বাঁধন এত নরম যে ছিঁড়তে মায়া লাগত। সেই সুযোগ নিয়ে ও একটু একটু করে তার সার্বাংগ জড়িয়ে ধরছিল। ঠিক যেন আলোকলতার মত, বড় নরম তার স্পর্শ, কিন্তু গাছকে আলিংগনের পর আলিংগনে এমন করে আঁকড়ে ধরে যে শেষে গাছের আর নড়বার শক্তি থাকে না। ঠিক তেমনি করেই লুসীও একটু একটু করে ঝড়ুকে ঘরমুখো করে ফেলছিল।... এখন সে বুঝতে পারছে, লুসী আর তার সেই ছেলেটা যদি বেঁচে থাকতো, তা হলে এক জোড়া শিকল তার পায়ে পড়ত।'[৬১] এভাবেই যে-বন্ধন ঝড়ুর জীবনে স্থিতির সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে, জাগতিক নির্মমতা সেই সম্ভাবনার সূত্রকে ছিন্ন করে দিয়ে গেছে।

এর পরেও কুচবিহারের আয়শা ক্ষণকালের জন্য জীবনকে আন্দোলিত করে এক বেদনাময় নৈঃসঙ্গ্যের মধ্যে তাকে নিক্ষেপ করে চলে যায়। ঝড়ুর জীবনে আর স্থিতি আসে না। 'প্রথমে পদ্‌মিনী, তারপর লুসী, তারপর আয়শা, একজন একজন করে তিনজনই তাকে ছেড়ে গেল। ঝড়ুর নৌকোটা ঘাটে ঘাটে এসে ভেড়ে, কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না।'

মানুষের জীবন তার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ঝড়ুর জীবনকথার অনুষঙ্গে সত্যেন সেনের সচেতন শিল্পী-মন যে-সত্য থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি। কিন্তু রাজনীতির প্রত্যক্ষ-পরিচয় এ-উপন্যাসের বারো পরিচ্ছেদেই প্রথম উল্লেখিত হয়েছে। ১৯৪৭-এর দেশবিভাগ, এবং তজ্জনিত সঙ্কটের ফলে বাংলার জনজীবনে যে সীমাহীন অনিশ্চয়তা নেমে এসেছিলো, সমাজ-অন্তর্গত কোনো ব্যক্তিই তা থেকে মুক্ত ছিলো না। সেয়ানাদের জীবনেও এই রাজনৈতিক আলোড়ন প্রভাব বিস্তার করে। 'এত আনন্দ উৎসবের চাঞ্চল্যে ঝড়ু মনেও রং লেগেছে। এতদিন সমাজদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল, আজ কেমন করে যেন সবার সঙ্গে অদ্ভুত রকমের একাত্মতা বোধ করছে। এরকম অভিজ্ঞতা এই তার প্রথম।'[৬২] কিন্তু এই বোধ ক্ষণস্থায়ী। যখন ঝড়ুর বন্ধু বিনোদ কলকাতায় চলে যায়, তখন সে বুঝতে পারে অসঙ্গত সামাজিক বিন্যাসের স্বরূপ। এ সময়কার ঝড়ুর মানসভাবনা তাৎপর্য-পূর্ণ, কেবল ঝড়ুর দিক থেকেই নয়, লেখকের জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য নির্দেশের ক্ষেত্রেও:

> একদিন পাকিস্তানকে সে মনে প্রাণে চেয়েছিল। কোন কিছু বৈষয়িক স্বার্থের লোভে নয়, নিছক ভাবাবেগের বশেই, সেই রহস্যের মর্মকথা বুঝে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তবু আজ সে খতিয়ে খতিয়ে দেখছে, পাকিস্তান তাকে কি দিয়েছে, শুধু তাই নয়, পাকিস্তান তার কাছ থেকে কি নিয়ে নিয়েছে।
>
> নিয়ে নিয়েছে বিনোদকে।...হিন্দুস্তান আর পাকিস্তানের শক্তির কাছে ওরা দু'জনেই হার মানল। এ এক বিরাট শক্তি। এর তুলনা চলে পদ্মার সর্বগ্রাসী ভাংগনের সঙ্গে। মায়া মমতা, ভালবাসা কোনো কিছুই তাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারল না। চোখের পানি মুছতে মুছতে বিনোদ চলে গেল।[৬৩]

অভিজ্ঞতার নতুন নতুন প্রান্তের উন্মোচন ঝড়ুর জীবনকে নিত্য নব সঙ্কট ও জিজ্ঞাসায় মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। এ যাবৎকালের জীবনধারা ও বর্তমানের মধ্যে কোনো সমন্বয় সাধন করতে পারে না সে। তার বেদনাময় অভিজ্ঞতার শেষ অগ্নিশিখা মিঠুয়া ও তার স্ত্রী সখিনার পরিণতি। পতিতাবৃত্তি সখিনার জীবনেরও যে অবলম্বন হবে, এ ছিলো তার কল্পনাতীত। পঙ্কিল জীবনস্রোতে ভাসমান ঝড়ুর কাছে সখিনার পরিণতি গভীর রক্তক্ষরণের কার্যকারণ। কিন্তু এ-রক্তপাত মীমাংসার পরিবর্তে কেবল যন্ত্রণাকেই ত্বরান্বিত করে, যার গতি পরিণামহীন, দিগ্‌চিহ্নহীন।

উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে (ষোল) সত্যেন সেন ঝড়ুর এই মানসযন্ত্রণার স্বরূপ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে উন্মোচন করেছেন:

> ট্রেন ছুটে চলেছে। ঝড়ু চোখ বুজে বুজে কত কথাই ভাবছিল! আজ বড় ক্লান্তি লাগছে। আর চলতে ইচ্ছা করছে না। ইচ্ছা হচ্ছে পথের মাঝখানে বসে পড়ে। এরকম মাঝে মাঝে যে না হয় তা নয়। কিন্তু আজকের মত আর কোনদিন হয়নি। মনে হচ্ছে, যেন তার দম ফুরিয়ে গেছে।
>
> সখিনার কথাগুলি, তার সেই অদ্ভুত দৃষ্টি আর অদ্ভুত হাসি সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। ওকে ওরা তিলে তিলে হত্যা করে চলেছে। ঝড়ুর মনে হল, ওদের মধ্যে সেও একজন। সমস্ত সেয়ানারাই যেন এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে।[৬৪]

ঝড়ুর বন্ধনভীরু মন একদিন ভেবেছিল, সে 'সেয়ানাজীবনের মধ্যে অবাধ মুক্তির সন্ধান পেয়েছে, আর আজ মনে হচ্ছে, এ যেন একটা জটিল ফাঁদ। ইঁদুরের কলের মত এর মধ্যে ঢুকবার পথ আছে, কিন্তু বেরোবার পথ নেই।' পঁচিশ বছরের বন্ধনহীন জীবনের উদ্দাম গতি অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যে এবং বেদনায় শান্তির স্মৃতিময় উৎসে প্রত্যাবর্তন করতে চায়। কিন্তু এযাবৎকালের সংস্কারকে অতিক্রম করতে পারে না। গৃহগত জীবন তার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে যেন। অভিজ্ঞতার হিসেবে নিজেকে বার্ধক্যের সমান্তরাল ভেবে চলমান ট্রেনে বসে জীবনের স্থিতির চিন্তায় উদগ্রীব হতেই 'মনে মনে নিজের বয়সটা হিসাব করতে গিয়ে সে চমকে উঠল। সে কি, মোটে ছাব্বিশ!'

এই অস্থিরতা, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার মধ্যেই উপন্যাস শেষ হয়েছে। একটা মীমাংসাহীন পরিণতির শূন্যতায় মণ্ডিত ঝড়ুর জীবনের অনিঃশেষ সম্মুখভূমি। স্থিতিহীন, বন্ধনহীন জীবনেও তো ইতিবাচক জীবনের পথনির্দেশ থাকতে পারে? কিন্তু ঝড়ু কোন পথের যাত্রী, অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্লেদ-গ্লানিজর্জর অতীতের, না, আলোকময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের?

"সেয়ানা" উপন্যাসে লেখকের নিরাসক্ত সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণই মুখ্য। ঝড়ু, মিঠুয়া বা অন্যান্যদের জীবনকথায় লেখকের শৈল্পিক দূরত্ব সমগ্র উপন্যাসেই সুস্পষ্ট। কিন্তু একটা অসঙ্গত সামাজিক জীবনবিন্যাসের মধ্যবর্তী অবক্ষয় নির্দেশে লেখক মুহূর্তের জন্যেও নীতি বা আদর্শের প্রশ্ন উত্থাপন করেননি, কেবল ঝড়ুর মধ্যে নিজ শ্রেণী-অবস্থান অনুযায়ী নীতি, বিবেক বা চিত্তচাঞ্চল্য জাগ্রত হয়েছে। এবং ঝড়ুর পরিণতি মীমাংসাহীন, অস্থির সামাজিক জীবনের সাথে যেন সমান্তরাল ভাবে উপস্থাপিত। সেখানে কেবল আত্মসমীক্ষাই সম্ভব, কিন্তু উত্তরণের দুর্লভ সিঁড়ি মানুষের অনায়ত্ত।

ছয়

সমাজসত্যের সমগ্রতার অঙ্গীকার সত্যেন সেনের ঔপন্যাসিক প্রতিভার গৌরবময় প্রান্ত। অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনকে নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করার ফলে তাঁর উপন্যাস তত্ত্বমুখ্য হয়ে ওঠেনি কখনো। পূর্ব-আলোচিত তিনটি উপন্যাসে আমরা লেখকের যে বৈচিত্র্যপ্রিয়তা প্রত্যক্ষ করি, সেখানে জীবনই মুখ্য উপাদান হিসেবে বিন্যস্ত, তত্ত্ব নয়। এ ক্ষেত্রে বিষয় গৌরব-ই তাঁর উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দিক। বিষয়-বিস্তারের দিক থেকে "একুল ভাঙ্গে ওকুল গড়ে"[৬৫] তাঁর উপন্যাসসমূহের মধ্যে স্বতন্ত্র ও তাৎপর্যমণ্ডিত। গ্রামজীবনভিত্তিক উপন্যাস হিসেবেই কেবল নয়, বাংলাদেশের একটা বিশেষ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবন-সমগ্রতার অঙ্গীকার, তাদের দ্বন্দ্বময় জীবনপ্রবাহ, মৃত্তিকাসংলগ্ন কর্ম-ধারা ও আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমির বিন্যাস এ-উপন্যাসকে একটি স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে। "পদচিহ্ন" উপন্যাসের পটভূমিও গ্রাম; সেখানে বিভাগোত্তরকালের বাংলাদেশের সামাজিক-বিবর্তন ও অবক্ষয়

নির্দেশই ছিলো লেখকের অন্বিষ্ট। কর্মচঞ্চল গ্রাম সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু "একুল ভাঙ্গে ওকুল গড়ে" উপন্যাসে বিধৃত গ্রাম কর্মচঞ্চল---যে-কর্মচাঞ্চল্য প্রাকৃতিক ঔদার্য ও বৈগুণ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মৃত্তিকাসংলগ্ন জীবনের শিল্পরূপ নির্মাণে সত্যেন সেন সমাজের বহির্গত ভাঙ্গা-গড়ার সাথে সাথে তার অন্তর্লোককেও অবলোকন করেছেন গভীরভাবে। তাঁর সমাজদৃষ্টির উজ্জ্বলতম প্রান্ত হচ্ছে সম্প্রদায়নিরপেক্ষতা। প্রতিটি উপন্যাসের কাহিনী নির্বাচন, চরিত্র নির্মাণ এবং চরিত্রপুঞ্জের গতিবিধি উন্মোচনে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির এই ঔজ্জ্বল্য সুস্পষ্ট। "পদচিহ্ন" উপন্যাসে একটা বেদনাময় আবহের মধ্যে উপস্থাপিত অতীত-বর্তমানে বিস্তৃত গ্রামকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি। তাঁর মানস-প্রতিভাসের প্রতিনিধি দুই তরুণ---সেই গ্রামজীবনকে, তার বর্ণাঢ্য অতীত এবং অবক্ষয়গ্রস্ত বর্তমানকে পেছনে ফেলে যাত্রা করেছিলো নগরজীবন অভিমুখে। কিন্তু "একুল ভাঙ্গে ওকুল গড়ে" উপন্যাসে সেই গ্রামজীবনেরই উৎসমূলে প্রত্যাবর্তন করেছেন সত্যেন সেন। অবশ্য এ-গ্রাম বিভাগোত্তর কালের গ্রাম নয়---নদীর উপকূলবর্তী ভাঙন এবং নির্মাণের প্রাকৃতিক বৈগুণ্যে লালিত মানবজীবন-অধ্যুষিত গ্রাম। সাতচল্লিশের দেশ-বিভাগের অভিঘাত-আন্দোলনের ক্ষীণ স্পন্দন সেখানে জাগলেও, মূলতঃ প্রবাহমান বাঙালি-জীবনের একটা আঞ্চলিক স্বরূপ উন্মোচনই যেন এ-উপন্যাসে লেখকের অন্বিষ্ট।

রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দী হিসেবে অবস্থানকালে এক কয়েদীর বর্ণিত জীবনকথা এ-উপন্যাসের আখ্যান-উৎস। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন-অবলোকনের অনুষঙ্গে বিশেষ অঞ্চলের জীবনসমগ্রতাকে স্পর্শ করার কৃতিত্ব লেখকের নিজস্ব। প্রসঙ্গত লেখকের প্রাক্-কথন এখানে উল্লেখযোগ্য: "যশোর জেলার খরস্রোত কালী নদীর দুপার ঘেষে বাচ্চু আর দুপারের চরের বাসিন্দাদের তরঙ্গসঙ্কুল জীবনস্রোত বয়ে এসেছে, বাচ্চু একটু একটু করে অনেক কথাই শুনালো। কালী নদীর একুল ভেঙ্গে ওকুল গড়ে উঠেছে। বাচ্চুদের জীবনেও সেই একই ভাঙ্গা-গড়ার খেলা। বাচ্চুর জীবনকথা তাদের সকলের জীবনকথার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে মিশে আছে। তাদের সকলের জীবন নিয়েই বাচ্চুর জীবন।'[৬৬] ব্যক্তির জীবনকথায় সমগ্রের জীবন-সন্ধানের এই মানসদৃষ্টি সত্যেন সেনের সাহিত্য-বোধের বিশেষত্বনির্দেশক প্রান্ত।

গ্রন্থ-সূচনার পূর্বে উপন্যাস-বর্ণিত বিষয়ের যে ভূ-প্রাকৃতিক ও মানসিক চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক, তা সমগ্র উপন্যাসের সার-সত্যের ইঙ্গিতময় আলেখ্য হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি ও প্রতিপক্ষ মানুষের সাথে নিয়ত সংগ্রামরত জীবনপ্রবাহকে ভাঙন এবং নির্মাণশীল নদীর সাথে পরস্পরিত করেছেন লেখক। নদীর এক পারে কণকসার, মামুদপুর, বামুনহাটি, মোল্লার চক, বশুনিয়া এবং অন্য পারে আমতলী, সুপারিবাগ, চন্দনধুল, চর হায়দ্রাবাদ, মিঠাপুকুর, রায়নগর প্রভৃতি গ্রাম। নদীর করাল আক্রোশ যেমন দু-পারের গ্রামকে গ্রাস করে, তেমনি নদীর মাঝখানে জেগে ওঠা চরের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দু'পারের অধিবাসীরাই রক্তমাতাল হয়ে ওঠে। জমিকে কেন্দ্র করে ক্ষেত্রজীব মানুষের এই ক্ষত্রিয় স্বভাববৈশিষ্ট্য ভূ-প্রাকৃতিক প্যাটার্নের-ই অবশ্যম্ভাবী বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই সংগ্রামরত মানবপরম্পরার জীবনকথা সময়ের বহমানতায় এক সময় হারিয়ে যায়, নদীর স্রোতের মতো। সেই বিক্ষিপ্ত তরঙ্গ-আন্দোলিত কাহিনীর শ্রুত অংশখণ্ডকে একটা উপন্যাসের সমগ্রতায় বিন্যস্ত করেছেন সত্যেন সেন।

কাহিনীর নায়ক বাচ্চু। কিন্তু কেন্দ্রীয় বিষয় কেবল বাচ্চুর জীবন-কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি----কালী নদীর দুই তীরবর্তী মানুষের অন্তর্গত-বহির্গত জীবনসমগ্রতার উন্মোচনে লেখকের অন্বেষা একটা বৃহত্তর জীবনজিজ্ঞাসায় উচ্চকিত। ফলে, নদীমাতৃক, গ্রামজীবন-কেন্দ্রিক সমগ্র বাংলাদেশের-ই একটা বিশেষ সময় ও সমাজসত্যকে শিল্পায়িত করেছেন লেখক। প্রথমাবধি বাচ্চু বন্ধনভীরু---পারিবারিক বন্ধন, কৃষিনির্ভর জীবনের কঠোর পরিশ্রম তাকে আকর্ষণ করে না--অনেকটা "সেয়ানা" উপন্যাসের ঝড়ুর মতোই। কিন্তু ঝড়ু যেখানে শিক্ষার অনায়াসলব্ধ সুযোগকেও চরম ঔদাসিন্যে প্রত্যাখ্যান করেছিলো, বাচ্চুর শৈশব-কৈশোরে সে জাতীয় কোনো সুযোগ ছিলো না। পক্ষান্তরে, সে বয়সে 'ভাগ্যবানের' ছেলেরা 'খেলাধূলা আর লেখাপড়া করে কাটায়', যে বয়সে বাচ্চুর মতো ছেলেদেরকে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়। কিন্তু বাচ্চুর বন্ধনভীরুতাকে মিঠুয়ার মতো কোনো অপশক্তি চরম পরিণতির মধ্যে নিক্ষেপ করেনি। ফলে, জীবনপ্যার্টানের সাথে সঙ্গতি রেখেই তার জীবনরে গতি বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়। গ্রামজীবনের সরল ও সতেজ স্পর্শেই তা যেন বিকৃতিহীন। স্নেহ-মমতার নিবিড় আশ্রয়

বাচ্চুকে বিড়ম্বিত করে না, বরং একটা বৈচিত্র্যের স্পর্শে চঞ্চল করে তোলে।

নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে 'এ কুল ভাঙ্গে ও কুল গড়ে' উপন্যাসের সূচনা। বাচ্চুর পারিবারিক পরিচয় উন্মোচনের পূর্বেই নির্দেশিত হয়েছে তার গৃহত্যাগের কার্যকারণ :

> বাচ্চু আর রফিক বকরী চরাতে গিয়েছিল। এমন ওরা রোজই যায়। কিন্তু এমন অঘটন আর কোনদিন ঘটেনি। বিপদ যখন আসে, আগে থেকে কোন রকম সংকেত জানিয়ে আসে না তো। বলা নেই, কওয়া নেই, এমন হঠাৎ এসে হড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে, যে তখন আর তাকে সামাল দেওয়া যায় না। সামান্য একটা বকরীর বাচ্চা, আর কিছু নয়, তার জন্যই বাচ্চুকে ঘর ছাড়তে হোল।[৬৭]

এই বর্ণনাধর্মী নাটকীয়তার মধ্যে বাচ্চুর পরবর্তী জীবনধারার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। ইঙ্গিতময় সূচনার পরেই লেখক রচনা করেছেন বাচ্চুর ব্যক্তিক এবং পারিবারিক পটভূমি, তার মানসগড়নের ইতিকথা ; এবং সেই সূত্রে একটা জীবনবলয়ের পারিবারিক বিন্যাসের স্বরূপ। প্রথাগত কৃষি-ভিত্তিক জীবনেও মাঝে মধ্যে বাচ্চুর মতো বেপরোয়া সন্তানের জন্ম হয়। আর সে-কারণেই সে নিজের মতো করে, নিজের স্বাধীনতা ও আনন্দের অনুষঙ্গী কর্মজগৎ সন্ধান করে। তার স্বতন্ত্র অভিরুচিকে কার্যকর করার জন্যই পিতা আব্বাস আলী ছোট সন্তান বাচ্চুর জন্যে একটি বকরী কিনে দেয়। বাচ্চুর 'খেলাধূলা আর মাঠে ঘাটে বাজারে বন্দরে পালিয়ে বেড়ানো' মন হয়তো বা স্থিতিশীল হবে, এই আশায়। কিন্তু বাচ্চুর জগৎ প্রথম পর্যায়ে স্বসৃষ্ট অধিকারে আনন্দদায়ক হলেও, তার আকর্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। বকরীগুলো নিয়ে যে 'পারিবারিক আব-হাওয়া' গড়ে উঠেছিলো, 'নতুনত্বটা কেটে যেতেই কেমন যেন একঘেয়ে হয়ে আসতে লাগল।' সখের কাজ যখন বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়, তখনই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে বাচ্চুর মন। 'ওর মনে হলো ওরা যেন তার পায়ের শিকল। এই শিকল টানতে টানতে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করা যায় না।'---এ-অবস্থায় প্রকৃতির উদ্দামতায় অনাবিল মুক্তিময় নিকট-অতীতের স্মৃতি বাচ্চুর মনোজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এরই মধ্যে

একদিন বকরীগুলোকে মাঠের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্বিগ্নভাবে খেলার সময়, একটি বকরী শেয়ালের আক্রমণে মারা যায়। ফলে, বাচ্চু পিতার প্রহারের ভয়ে স্বন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পরিবর্তে পার্শ্ববর্তী গ্রামে ফুফুর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এভাবেই গ্রন্থ-সূচনায় উল্লেখিত ইঙ্গিতময় বর্ণনায় নেপথ্য পটভূমি প্রলম্বিত কাহিনীর আশ্রয়ে উন্মোচন করেছেন সত্যেন সেন। প্রথম দিকে পিতা আব্বাস আলি ফুফুর বাড়ি বাচ্চুকে নিতে আসলে সে দ্রুত দৃষ্টিসীমা ও আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। পরিণামে অকর্মা ছেলের প্রতি পিতার ঔদাসিন্য এবং ফুফুর স্নেহ বাচ্চুর অবস্থান নির্দিষ্ট করে দেয় ফুফুর বাড়িতেই। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ বাচ্চুর পারিবারিক অবস্থা, মনস্তত্ত্ব এবং কাহিনীর মৌল সত্যের প্রাথমিক ইঙ্গিতের মধ্য দিয়েই শেষ হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-এ উপন্যাসের কাহিনী গ্রামজীবন-অন্তবর্তী কৃষি-ভিত্তিক পরিবারের চারিত্র উন্মোচনে বিশেষত্বপূর্ণ। মানুষের রক্তের সম্পর্ক কি করে বৈষয়িক জীবনের সূত্র ধরে বিপন্ন হয়ে পড়ে, উত্তরাধিকারীত্বের অখণ্ড বোধ ব্যক্তির অভিরুচি, মনস্তত্ত্ব এবং জৈবনিক সক্রিয়তায় কিভাবে স্বতন্ত্র গতি পায়----তার অনুপুঙখ বর্ণনা করেছেন সত্যেন সেন। এভাবেই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সমষ্টির মধ্যে উপন্যাস-কাহিনীর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েজেছে ক্রমাগত। ঘটনার এই ক্রমপ্রবাহে সমাজের অন্তর্নিহিত জৈবলালসার গরলরূপও উপন্যাস-বিধৃত জীবনেরই অনুষঙ্গী। আলমাস এবং আনুর মা-কেন্দ্রিক ঘটনায় সে-সত্যের প্রলিফলন ঘটেছে। বাচ্চু কৈশোরিক বিস্ময়ে অবলোকন করলেও তার জীবনাভিজ্ঞতায় এ এক ভিন্নতর সংযোজন।

নীতি এবং মূল্যজ্ঞানবিবর্জিত বিষয়ও কিভাবে গ্রামীণ জীবনের ঐক্যকে খণ্ডিত করে দেয়, আলমাস এবং আনুর মার মধ্যে সংঘটিত ঘটনার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় তা সুস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে ঘটনার গতি যেমন হয়েছে বিচিত্রমুখী, তেমনি কখনো কখনো বাচ্চু-বিকেন্দ্রিক। কিন্তু পরিণামে বাচ্চুর জীবন বলয়ের অর্ন্তভুক্ত বলেই সূক্ষ্ম সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়নি কখনো। দু'জন নারী-পুরুষের সংস্পর্কজাত দ্বন্দ্বের পরিণাম গ্রামীণ জীবনে যে দলাদলির সূত্রপাত ঘটালো, কনকসারের নিস্তরঙ্গ জীবনে তার

প্রতিক্রিয়া হলো সুদূরপ্রসারী ; এমন কি, বাচ্চুর ব্যক্তিক এবং পারিবারিক জীবনেও :

> ...এবারকার দলাদলি অন্যান্য বারের মত স্বল্পায়ু নিয়ে আসেনি। বেশ পাকাপাকিভাবেই তা ঘাঁটি গেড়ে বসল, আর বহুদিন ধরে শাখা প্রশাখায় তার জের চলল। প্রথম অবস্থায় এই দলাদলির আঁচটা বাচ্চুর গায়ে না লাগলেও পরবর্তী জীবনে তাকে এজন্য বেশ ভুগতে হয়েছে।[৬৮]

বাচ্চুর চাচা আলমাস ও আনুর মা-কেন্দ্রিক ঘটনার জের শেষ পর্যন্ত মামলায় রূপ নিলো। এবং এই মামলাকে কেন্দ্র করে উপন্যাস-কাহিনীতে কনকসার গ্রামের অন্তর্গত অসঙ্গতির চিত্র যেমন উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি মানবিক সৌহার্দ্য এবং বন্ধুত্বের অতুলনীয় দৃষ্টান্তও স্থাপিত হয়েছে। ঘটনার এক প্রান্তে যদি সুরেন ঘোষের অবস্থান নির্দেশিত হয়, তবে তার অন্ধকারাচ্ছন্ন অপর প্রান্তে স্থান পাবে করিম সিকদার। আব্বাস জমি বন্ধক রেখে মামলায় অর্থ ব্যয় করে যখন নিঃস্ব, তখন সুরেন ঘোষ জমি পুনরুদ্ধারের জন্য তাকে টাকা ঋণ দেয়, অন্যদিকে টাকা হস্তগত হলে, করিম সিকদার কৌশল এবং মিথ্যার আশ্রয়ে তাকে প্রতারণা করে। সুরেন ঘোষের মানবিক ঔদার্য উন্মোচনের পাশাপাশি তৎকালীন হিন্দুমানসের সংকীর্ণচিত্ততার স্বরূপ বিধৃত হয়েছে নরেন ঘোষের আচরণে ও বক্তব্যে। কংগ্রেসী রাজনীতিতে বিশ্বাসী হলেও নরেন ঘোষের নিকট হিন্দু-মুসলমানের সহৃদয়-সম্পর্ক অবান্তর। দু'জনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এ-সত্যেরই যথার্থ অভিব্যক্তি ঘটেছে :

> "বন্ধুবান্ধব!" নরেন ঘোষ হেসে উঠল, 'বন্ধুটা আবার কে! আব্বাস আলী! তুমি হাসালে দাদা। আচ্ছা, তুমিই বল, তেলে আর জলে মিশ খায় কখনও?"
> "না, তা মেশে না।"
> "তবে?"
> সুরেন ঘোষ একটু থেমে থেকে তারপর বলল, "তেলে তেলেই কি মেশে সব সময়! তাই যদি মিশবে, তাহলে ওদের এই মারামারি কাটাকাটি কিসের জন্য?"

"ওদের কথা বোলো না। ওরা আজ ভাঙবে, কালই আবার জুড়ে যাবে। কিন্তু হিন্দু আর মুসলমান, একি কখনও এক হতে পারে?"

"পারে না?" সুরেন ঘোষ শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

"না, পারে না। সে চেষ্টা অনেক করে দেখা হয়েছে। কিন্তু বৃথা। তা হবার নয়।"

"তুই না কংগ্রেসে কাজ করিস? তবে কি মহাত্মা গান্ধী যা বলেন, সবই মিছে কথা? আর তোরা যে হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা প্রচার করে বেড়াস্ নিজেরাই তা বিশ্বাস করিস্ না?

নরেন ঘোষ এবার চুপ করে গেল। এ কথার কোন উত্তর সে খুঁজে পেল না।[৬৯]

এভাবেই কনকসার গ্রামের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে উপন্যাসে। নদীর কুল ভাঙা-গড়ার সাথে মানুষের জীবনপ্রক্রিয়ার যে সম্পর্ক, সামসময়িক জাতীয় রাজনীতির অস্থির ও জটিল গতিপ্রকৃতির ভূমিকাও সেক্ষেত্রে কম নয়। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এই রূপ উপন্যাসের আটাশ পরিচ্ছেদে বিস্তৃত-ভাবে অঙ্কিত হয়েছে বয়স, অভিজ্ঞতা এবং চিন্তায় পরিপক্ব বাচ্চু ও তার পরিপার্শ্বকে আশ্রয় করে। কিন্তু এ-উপন্যাসে মানবীয় জীবনসংগ্রাম ও তার অনির্দ্দেশ্য পরিণতির রূপালেখ্য নির্মাণই লেখকের অন্বিষ্ট।

কাজীরবাগ গ্রামে ফুফুর আশ্রয়ে ও স্নেহে বাচ্চুর বন্ধনহীন কৈশোর অতিবাহিত হলেও তাকে শেষপর্যন্ত নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। কারণ, অকর্মণ্য তারুণ্য সে-বাড়ির কর্তাব্যক্তিদের কাছে প্রশ্রয় পায়নি সঙ্গত কারণেই। উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদের আলমাসের স্ত্রী মাজেদার অর্থাৎ ছোট চাচীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাচ্চুর জীবনে ঘটে প্রথম মৃত্যু-অভিজ্ঞতা। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বাচ্চুর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন। সপ্তম পরিচ্ছেদে মায়ের মৃত্যু বাচ্চুর জীবনচেতনার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গ্রামের বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যেও এই দু-টি মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে বাচ্চুর জীবনাভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যেমন প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে,

তেমনি উপন্যাসকাহিনীও বাচ্চুর অন্তর্গত রক্তক্ষরণ এবং আত্ম-জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে পল্লবিত হবার অবকাশ পায়। কিন্তু এর ফলে তার উদ্দেশ্যহীন, কর্মহীন জীবনপরিক্রমার কোনো পরিবর্তন সাধিত হলো না। এ-অবস্থায়ই সুরেন ঘোষের পারিবারিক জীবনের সাথে স্থাপিত হলো বাচ্চুর গভীর মমতার সম্পর্ক। সুরেন ঘোষের সন্তানহীনা স্ত্রী বিন্দুবাসিনী বাচ্চুর মধ্যে তার 'গোপাল'কে পেয়ে বাৎসল্যের বেদনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

বাচ্চুর ব্যক্তি-জীবনের বেড়ে-ওঠার পারিপার্শ্বিকতায় আরও অজস্র ঘটনাবলীর সমাবেশ ঘটেছে। জমি নিয়ে বাচ্চুর পিতা আব্বাস এবং বড় চাচা আক্কাসের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্ব গ্রামীণ জীবন-অন্তর্গত আবহমান অসঙ্গতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বাবলম্ব হয়ে-ওঠার ক্ষেত্রে বাচ্চু প্রাথমিকভাবে কিছুটা সচেষ্ট হলেও প্রথমে বিন্দুবাসিনীর স্নেহের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে এবং পরে সিধু ঠাকুরের গানের দলে যোগদানের ফলে তার পরিজন-বিকেন্দ্রিক জীবন পুনরায় গতি পেলো। এ-পর্যায়ে 'সুরেন ঘোষের দূর সম্পর্কের নাতনী' 'সুনীতি ওরফে সুনু'র সাথে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতায় বাচ্চুর বহির্মুখী জীবনে কিছুটা অন্তর্মুখী প্রবণতা জন্ম নেয়। কিন্তু যে বস্তুজাগতিক ভাঙা-গড়ায় কালী নদীর দুই তীরবর্তী জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রার গতি নির্ধারিত, বাচ্চুর ব্যক্তিজীবন-স্রোত তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সে-কারণেই সিধু ঠাকুরের গানের দল যেমন এক সময় ভাঙনের সম্মুখীন হয়, তেমনি বাচ্চুও নবতর জীবনসঙ্কটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। সুনীতির সাথে সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী হলেও বাচ্চুর জীবনে তা এক সংবেদনময় ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। সুনুর কাছে বাচ্চু যেমন এক 'অপরিচিত বিস্ময়', তেমনি সুনুও বাচ্চুর অন্তর্মুখী জীবনস্রোতের উৎসমুখ। তার আত্মসম্ভ্রমবোধ, পৌরুষ এবং যৌবনসচেতনতার সূচনা মূলত সুনু-কে কেন্দ্র করেই। বড় চাচা আক্কাস আলীর মৃত্যুর পর বড় চাচীর স্নেহাশ্রয় এবং তার জমি চাষের আগ্রহ বাচ্চুর কর্ম-উদ্দীপনার নতুন পর্ব; এবং সেই সাথে মৎস শিকারের নব্য-উদ্ভূত নেশাও তাকে অনেকটা সংঘজীবনমুখী করে তোলে।

উপন্যাসের বারো পরিচ্ছেদ থেকে উপন্যাস-কাহিনী ক্রমাগত বাচ্চু-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। স্বাবলম্বন-প্রত্যাশী বাচ্চু হয়ে উঠেছে উপন্যাসবিধৃত

ঘটনাপুঞ্জের ক্রিয়াশীল অস্তিত্ব। পিতার প্রহারে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার অদম্য ইচ্ছায় সে বেদে মোচনের শরণাপন্ন হয়। বাচ্চুর এই বেদে জীবন-সম্পৃক্তির মধ্য দি[illegible]ত্যেন সেনের জীবনাভিজ্ঞতার নতুন প্রান্ত উন্মোচিত হয়েছে। নদীর দুই তীরবর্তী জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্রের রূপায়ণ ঘটাতে গিয়ে জীবনের সমগ্রতা-সন্ধানী লেখক নদীর ভাসমান জন-জীবনকেও প্রত্যক্ষ করেছেন আন্তরিকভাবে। বেদের মেয়ে ঝুমনির সাথে পরিচয় বাচ্চুর নারীসম্পর্কিত সংস্কারকেই কেবল আলোড়িত করেনি, তার বিচার-শক্তি এবং আত্মজিজ্ঞাসাকেও প্রবল করে তুলেছে :

> এ রকম ছটফটানি তার জীবনে এই প্রথম। তার ঘুমন্ত ইন্দ্রিয়-গুলি যেন সজাগ হয়ে উঠেছে। আর কি আশ্চর্য, ঠিক এই সময় সুনুর কথা তার যেন আরও বেশী করে মনে পড়তে লাগল। সুনুর কথা এখন সে যেমন করে ভাবে, আগে এমন করে ভাবতে পারত না। ঝুমনি আর সুনু তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দুজনের কথা ভাবতেই তার ভাল লাগে। কিন্তু ঝুমনি তো হাতের কাছে, আর সুনু বহুদূরে। ঝুমনি কিন্তু এখনও তার দিকে তাকিয়ে তেমনি করে হাসে। এখন বাচ্চু সেই হাসির মানে বুঝতে পারে। বুঝতে পারে কেন ওকে ডাকছে। যেমন করে সেদিন ডেকেছিল।[১০]

কিন্তু ঝুমনি প্রসঙ্গ এ-পর্যন্তই। ভাই বসিরের আকস্মিক আগমনে বাচ্চুর বেদে-জীবনের এখানেই যবনিকাপাত ঘটলো—মিলিয়ে গেলো ঝুমনি, স্ফুলিঙ্গের মতো, তরঙ্গিত নদীপ্রবাহের বুদ্বুদের মতো।

তেরো-পরিচ্ছেদ থেকে বাচ্চুর ব্যক্তিজীবন এবং পারিপার্শ্বিক জীবন সমান্তরালভাবে ঘটনাবহুল হয়ে উঠেছে। বাচ্চুর বাল্যকালের খেলার সঙ্গিনী অকালবিধবা ছুটুর সমাজসংস্কারবহির্ভূত জীবনাচরণ ও মর্মন্তুদ পরিণতি বাচ্চুর মধ্যে এক বেদনাময় অনুভব সঞ্চার করে। কিন্তু একই সময়ে বহির্জীবনে এবং বাচ্চুর ব্যক্তিগত জীবনে দুটো ঘটনা সংঘটিত হয়। কনকসারের সিধু ঠাকুরের দলের প্রথাগত পালা গানের অনুষ্ঠান রামনগরের শিক্ষিত তরুণদের আগমনে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো। প্রথাসিদ্ধ কৃষ্ণযাত্রা দলের নট-নটী অপেক্ষা রামনগরের বাবুদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত থিয়েটারের নট-নটীদের ঔজ্জ্বল্য তরুণ-তরুণীদের নিকট

অধিকতর আকর্ষণীয়। বহির্জগতের তরঙ্গ এসে গ্রামীণ জীবনের আবহমান সংস্কৃতিকে এ-ভাবেই করে তোলে বিপন্ন। কিন্তু বাচ্চুর ব্যক্তিজীবনে সংঘটিত ঘটনা সমগ্র উপন্যাস-কাহিনীর অন্তর্গত এক প্রবল তরঙ্গ—এই তরঙ্গের আশ্রয়েই লেখকও যেন অনেকাংশে সমকালীন সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক জীবনকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। পূজোকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিমের সম্মিলিত সাংস্কৃতিক আনন্দ-উদ্‌যাপন বাঙালি-জীবনের অনিবার্য অংশ। পূজো-দর্শনে সুনু এবং বাচ্চুর একত্র-যাত্রা, প্রবল বর্ষণের মধ্যে ভিজে নতুন চেতনা নিয়ে প্রত্যাবর্তন এবং পূজো-উপলক্ষে গ্রামে প্রত্যাগত সুরেন ঘোষের ছোটভাই নরেন ঘোষ ও তার স্ত্রী মলিনার সংস্কারবদ্ধ, সংকীর্ণ এবং ক্রূর দৃষ্টিপাতে বাচ্চুর প্রেমময় জীবনদৃশ্যের আকস্মিক যবনিকাপাত উদ্‌ঘাটনে সত্যেন সেনের ঔপন্যাসিক শিল্প-দৃষ্টির স্বতন্ত্র মাত্রা প্রকাশ পেয়েছে।

দুইটি ঘটনার সন্নিকট (Juxtaposed) উপস্থাপনে সত্যেন সেনের জীবনদৃষ্টি আমাদের পূর্বধারণাসূত্রে গতিচ্যুত হলেও, শিল্পবিনির্মাণের দিক থেকে মূল্যবান।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ অভিন্ন সময়ে সংঘঠিত তিনটি ঘটনার কার্যকারণসূত্র। বৃষ্টিহাওয়ার প্রাবল্যে সুনু বাচ্চুর নিকটবর্তী হয়েছে, বিগত-যৌবন নরেন-মলিনার পাতা ঝরা পৌষের তপোবনে সঞ্চারিত হয়েছে যৌবনের উন্মাদনা, আর ছুটুর অতৃপ্ত যৌবনবেদনা মাসুদের প্রত্যাখ্যানে বৃষ্টিধারায় যায় ভেসে। বাচ্চুর জীবনে এ-অভিজ্ঞতা নতুন, সুনুর জীবনেও—যে-অভিজ্ঞতা আত্মনিবেদন ও সমর্পনে প্রেমময়, প্রাণপ্রদীপ্ত :

> বাচ্চু দেখতে পেল যে সুনুর চোখ দুটি হাসছে। কেমন করে হাসছে? হঠাৎ মনে পড়ে গেল ঝুমনিও ঠিক এমনি করেই হেসেছিল।
>
> ——আর হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল। কিন্তু তার সেই ডাকে সাড়া দিতে গিয়েও তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল। কিন্তু আজ ঝুমনির সেই ডাকে সাড়া না দিয়ে সে পারবে না। ঝুমনি না সুনু? তাইতো। কিন্তু ততক্ষণে সুনুকে সে তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে। সুনু কোন বাধা দিল না।

ওর জীবনে এই প্রথম। সুনুর জীবনেও। কয়েকটি মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে গেল।

"তুমি রাগ করেছ সুনু?" আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল বাচ্চু।

"দুর রাগ করব কেন?" সুনু তার চেয়েও মৃদুস্বরে উত্তর দিল। বাচ্চু একটু ভাবল, শেষে বলল, "আমি যে মুসলমান।"
"তাতে কি?"

"তোমরা ভদ্রলোক লেখাপড়া জান। আমি যে একেবারেই মুখ্যু। সুনু একইভাবে উত্তর দিল, "তাতে কি?" ভালবাসার কাছে সবই সমান।"

যে সব বইতে ভালবাসার কথা লেখা থাকে, তেমন বই সুনু অনেক পড়েছে।[৭১]

বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায় একই অবস্থানে আর একটি ঘটনা সংঘটিত হলো। নতুন অভিজ্ঞতা না হলেও নরেন-মলিনার জীবনে এ-অনুভবটা নতুন:

——নরেন আর মলিনা বাইরে থেকে ভিজতে ভিজতে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছে। ওরা কোথায় যেন গিয়েছিল। বাইরের দরজাটা খোলা পেয়ে ওরাও এখানে এসে ঢুকে পড়ল। বাচ্চু আর সুনু ঠিক এমনিভাবেই এখানে ঢুকে পড়েছিল। --মহা-প্লাবনের সময় নূহের নৌকায় যেন দুই জোড়া প্রাণী এসে আশ্রয় নিয়েছে। মাঝখানে একটা আড়াল। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

নরেন তরুণ নয়, মলিনাও তরুণী নয়। সেদিন ওরা অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। কিন্তু এই ঝড়বৃষ্টির পাগলামি আর মাতামাতির তাড়নায় সেই খেয়াল তখন ওদের ছিল না।—প্রবল ধারাবর্ষণে প্রবীণতার পাতলা ধূসর রংটা ধু'য়ে মুছে গেল নাকি? নাকি তারুণ্য যখন চলে যায়, একেবারে চলে যায় না?[৭২]

এই প্রবল ধারাবর্ষণ যেমন দুই জোড়া প্রাণীকে একত্রিত করেছে, তেমনি নব-অভিজ্ঞতায় আন্দোড়িত-স্পন্দিত তরুণ-তরুণীকে নিক্ষেপ

করেছে চরম অন্ধকারে। প্রাকৃতিক ধারা-বর্ষণ বাচ্চু-সুনুর জবিনগতি চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দিলো। বাচ্চু এবং সুনু যখন নরেন-মলিনার সম্মুখীন হলো, তখন একদিকে যেমন প্রবীণতার ধূসর রংটা গাঢ় হয়ে উঠলো, অন্যদিকে তেমনি বাচ্চু-সুনুর প্রেমদৃশ্যের ঘটলো চির যবনিকাপাত।

সত্যেন সেন সমান্তরাল-সংঘটিত তিনটি ঘটনার সাথে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা বৈগুণ্যকে প্রতীকায়িত করেছেন। লেখককথিত এই 'অসময়ের অন্ধকার' নরেন-মলিনার মনের বিদ্যুৎঝিলিককে আকস্মিক-ভাবে করেছে গাঢ় তমসাময়। ছুটুর জীবনেও বয়ে এনেছে প্রত্যাখ্যানের প্রবল ঝোড়ো-হাওয়া। নরেনের মধ্যে জেগে উঠেছে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প, মলিনার 'ঠোঁটের কোণায় একটি কূর হাসির রেখা।' এভাবেই বাচ্চুর জীবনে সুনুকেন্দ্রিক ঘটনার পরিসমাপ্তি।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সত্যেন সেন চারটি চরিত্রের অন্তর্লোককে নিরাসক্তভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। নরেন-মলিনার দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন হলেও বিন্দুবাসিনীর ক্ষেত্রে ঘটনার আকস্মিকতা হলো মর্মান্তিক—বিশেষ করে নরেন এবং মলিনার পরিচর্যায়। কিন্তু সুরেন ঘোষ সুবিবেচকের মতোই এ-ঘটনাকে গ্রহণ করে----তার কাছে এর আকস্মিকতা এবং স্বাভাবিকতা তুল্যমূল্য। যে-কারণে বাচ্চুর প্রতি পূর্বের মতোই তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যায় অপরিবর্তনীয়। পক্ষান্তরে, নরেন-মলিনার সংকীর্ণ মনোবৃত্তির তাৎক্ষণিক আকর্ষণ বিন্দুবাসিনীকে বিভ্রান্ত করলেও, তারা চলে যাবার পর তার আত্মসমীক্ষার উন্মোচন ঔপন্যাসিকের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। বাচ্চুর মধ্যে ঘটনার প্রতিক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী না হলেও তার মানব-অভিজ্ঞতা এবং যৌবনবোধের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে তার আত্মজিজ্ঞাসার উদ্‌ঘাটনে ঘটনাটি যেন নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে :

> সে রাত্রিতেও বাচ্চুর চোখেও ঘুম আসছিল না। একটা সন্ধ্যায় কত কি ঘটে গেল। কেমন করে যে কি হয়ে গেল। সে তো কোন কিছুর জন্যই তৈরী ছিল না। কাজটা সে ভাল করেনি। কিন্তু সুনু কেন তাকে অমন করে ছাতার তলায় যেতে ডাকল? সে তো যেতে চায়নি। কিন্তু সুনু এমন করে ডাকলে সে কেমন

করে না গিয়ে পারে? সেই থেকেই তো শুরু। তারপর সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে এল। সুনু না সে, এর জন্য দায়ী? যেই দায়ী হোক, কিন্তু কি অদ্ভুত আনন্দ।--- সব মেয়েই কি একই রকম? মনে পড়ে গেল ঝুমনিকে। সেও তার বুকের মধ্যে এমনি করে ঢেউ জাগিয়ে তুলেছিল। ঝুমনি আর সুনু যেন পাশাপাশি তার সামনে এসে দাঁড়ায়।[৭৩]

তার জীবনধারার সাথে সম্পর্কহীন হলেও হিন্দু-মুসলিম সমস্যার মতো জটিল জিজ্ঞাসাও বাচ্চুকে আলোড়িত করেছে। যেমন, নরেন ঘোষের 'মুসলমানের ছেলে হয়ে এত বড় সাহস! এই কথাটা ওর মনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে ফিরতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে রমিজের সেদিনের সেই কথাগুলি মনে পড়ে গেল। ওদের সঙ্গে আমাদের কক্ষনো মিল হতে পরে না। তেলে আর পানিতে কি মিশ খায় কখনও? সে ভাবতে লাগল, "এই কথাটাই কি তবে ঠিক?"[৭৪] এ-কথা যে সত্য নয় সুরেন ঘোষ বা বিন্দুবাসিনীর পরবর্তী আচরণ ও কর্মধারায় তা প্রমাণিত।

হিন্দুসমাজে যেমন নরেন ঘোষের মতো সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি-চালিত ব্যক্তির অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও রমিজের মতো তরুণের উপস্থিতি স্বাভাবিক। সতেরো পরিচ্ছেদের শেষে সত্যেন সেন হিন্দু-প্রধান রামনগর ও মুসলিম-প্রধান মিঠাপুকুর গ্রামের বহির্বাস্তবতা ও তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা নির্দেশে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির নিরাসক্তি সত্যিই বিস্ময়কর। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক কলহের অতিরিক্ত যে সংকট বাচ্চুর রাজনৈতিক কৌতূহলকে বাধাগ্রস্ত করে, তা হলো মিঠাপুকুর এবং কনকসার গ্রামের মধ্যবর্তী চিরকালীন দ্বন্দ্ব। যে-কারণে মিঠাপুকুরের ফরিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কনকসারে মুসলিম লীগের সমাবেশ হতে পারে না। এই রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াস অচিরেই নদীর কূলবর্তী জনগোষ্ঠীর জমি-দখলের তৎপরতায় স্তিমিত হয়ে পড়ে।

উপন্যাসের আঠারো-একুশ পরিচ্ছেদে সংঘটিত ঘটনাধারায় কেবল কনকসার, মিঠাপুকুর, চর হায়দ্রাবাদ এবং হাড়িদিয়ার জনজীবনের সংঘাতময় বহির্বাস্তবতাই চিত্রিত হয়নি, বাচ্চুর জীবনের জন্যেও হয়ে

উঠেছে পরিণামসঞ্চারী। জমি-দখলের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় বাচ্চু শুধু জড়িতই হয়নি, প্রতিপক্ষের শক্তিমান লাঠিয়াল রোস্তম সরদার তার সড়কির আঘাতে মৃত্যু বরণ করেছে। সত্যেন সেনের বাস্তবানুগ জীবনদৃষ্টি এই গ্রামীণ কোন্দলের যে চিত্র উন্মোচন করেছে, তা বর্ণনার অনুপুঙ্খতায় উজ্জ্বল। দাঙ্গা-পরবর্তী মামলা-মকদ্দমা, থানা-পুলিশ প্রভৃতি অনুষঙ্গী ঘটনা ও তৎ-সংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়াকেও লেখক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। যেমন :

> কালী নদীর দুপারের গ্রামের চাষীরা একটু 'বব্বর' হলেও একেবারে অবুঝ নয়। এই যুক্তিটাকে তারা উড়িয়ে দিতে পারে না। বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলে "যা বলেছে 'নেয্য' কথাই বলেছে। একশো কথার এক কথা।" কিন্তু এপার আর ওপারের সঙ্গে জমি নিয়ে যখন টানাটানি লাগে, তখন তাদের মাথার সমস্ত খুন যেন কলজের মধ্যে এসে জড় হয়। তখন আর হিতাহিত বিবেচনা করবার সময় থাকে না। কিন্তু মারামারির পর যখন প্রথমে পুলিশ, তারপর উকিলের তাণ্ডব শুরু হয়, তখন সবাই আফশোষ করে, আন্তরিকতার সঙ্গে অনুতাপ করে আর মনে মনে নাকে খৎ দিয়ে কিরা কেটে বলে---এবার যদি সারতে পারি, তবে জীবনে আর না। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এক সঙ্গে বেশীদিন শান্তিতে যেতে পারে না। আবার যখন দুপক্ষে টক্কর লাগে, তখন কিসের কি, ওসব কিরা টিরার কথা তখন আর মনে থাকে না। দীর্ঘদিন ধরে ওদের এই রীতিই চলে আসছে। কালী নদী সব কিছুর সাক্ষী।[৭৫]

গ্রামীণ দ্বন্দ্বের পটভূমিতে প্রতিপক্ষের সবচেয়ে শক্তিমাণ ব্যক্তিকে পরাস্ত করা গৌরবের বিষয় হলেও বাচ্চুর অনুভবে রোস্তম সর্দার এক যন্ত্রণা-দায়ক অনুষঙ্গে পরিণত হয়। ঔপন্যাসিকের ইতিবাচক জীবনান্বেষা বাচ্চুর এই আত্মসমীক্ষার মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছে বাঙময়, জীবন্ত। 'লড়াইয়ের উন্মাদনা, বিজয়ের উল্লাস, পুলিশ হামলার আতঙ্ক' কেটে যাবার পরও একারণেই বাচ্চু রোস্তম সরদারের মৃত্যু দৃশ্যটি ভুলতে পারে না। তার যন্ত্রণাদায়ক অনুভবের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত :

> সেদিনের কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারে না। মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়েছিল সে। রোস্তম সরদার উপুর হয়ে ঝুঁকে পড়েছিল।

সড়কিটা তার বুকের পাশ দিয়ে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফোয়ারার মত রক্ত ছুটল। আর রোস্তম সরদার আল্লাহ বলে এক পাশে কাত হয়ে পড়ে গেল। স্পষ্ট নিজের চোখে দেখেছে সে, স্পষ্ট নিজের কানে শুনেছে। সেই ছবি তার চোখের সামনে ভাসছে, সেই আর্তনাদ যেন কানের মধ্যে লেগে আছে। মারামারি থেমে গেলে পর সবাই কাছে গিয়ে রোস্তম সরদারকে ভাল করে নজর করে দেখেছে। কিন্তু বাচ্চু যায় নি, যেতে পারে নি।

তারপর থেকে রোস্তম সরদার কিছুতেই যেন তাকে ছাড়ছে না! এই রোস্তম সরদারের ভুলে যাওয়া মুখটা মনে করবার জন্য কতদিন কত চেষ্টা সে করেছে। আর আজ এত চেষ্টা করেও তার মুখটা ভুলে যেতে পারছে না।

এ তার কেমন হোল? মারামারির সময় কত লোক তো কত লোককে খুন করে, কিন্তু তাদের কারু মনের অবস্থা কি এমন হয়? হয় কি না হয়, বাচ্চু কেমন করে বলবে? তার নিজের মনটাকেই কি কেউ দেখতে পাচ্ছে? কে কার মনের খবর রাখে?[৭৬]

বাচ্চুর মানসিক গতির এই জ্বালাময় প্রতিক্রিয়ার রূপায়ণ ঔপন্যাসিকের সম্মুখসঞ্চারী অনুভবেরই বহিঃপ্রকাশ। কেননা, এই ঘটনার মধ্যেই উপন্যাসের পরিণামী নিষ্পত্তির সূত্র নিহিত। সমগ্র উপন্যাস-কাহিনীর অন্তর্গত একজন আপাতনিষ্ক্রিয় ব্যক্তি-অস্তিত্বের নেতিবাচক সক্রিয়তা কিভাবে হয়ে উঠেছে মর্মান্তিক পরিণামস্পর্শী, বাচ্চুর অনুভবগুচ্ছ যেন তারই অন্তরঙ্গ স্বরূপনির্দেশক।

উপন্যাসের কাহিনী এরপর অনেকটা দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং বাচ্চুকেন্দ্রিক। অবশ্য কালীনদীর দুই তীরবর্তী জনগোষ্ঠীর অনিবার্য অংশ হিসেবেই বাচ্চু চিত্রিত---তার জৈবিক ও মানসিক বিকাশের প্রতিটি স্তর যেন নির্মাণ ও ভাঙনশীল জনজীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাচ্চুর মাছ শিকারে পদ্মায় যাওয়া, নৌকা-ডুবির ফলে মৃত্যুর খবর প্রচার, পারিবারিক আবেষ্টনী এবং সুরেন ঘোষ-বিন্দুবাসিনীর মধ্যে তার বিচিত্রমাত্রিক প্রতিক্রিয়া এবং তিনজনের মধ্যে বাচ্চুসহ দু-জনের গ্রামে প্রত্যাবর্তন---আবহমান গ্রামীণ জীবন-দৈনন্দিনতারই একটা অংশ। কিন্তু সুরেন ঘোষ-

বিন্দুবাসিনীর বাৎসল্যময়, মমতাময় যে মানসরূপ এর ফলে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা সত্যই তুলনাহীন। জীবনের সমগ্র রূপ অন্বেষণে লেখকের ঐকান্তিকতা এর মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বাচ্চুর অন্তর্জীবনের স্বতন্ত্ররূপ অভিব্যক্ত হয়েছে, তার বিবাহসংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে। পারিবারিক অভিরুচি এবং নিয়মের কাছে নত না হয়ে নিজ আত্মমর্যাদাবোধ এবং অভিরুচিকেই সে গুরুত্ব দিয়েছে। প্রথাগত গ্রামীণ বিবাহপদ্ধতি পরিহার করে নিজ গ্রাম কনকসারের চিরকালের প্রতিপক্ষ মিঠাপুকুরের আয়ুবালির মেয়ে ছবিকে বিয়ে করে বাচ্চু—যে আয়ুবালি স্বয়ং রোস্তম সরদারের মৃত্যুঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। এরূপ শক্তিমান, পৌরুষদীপ্ত তরুণের নিকট কন্যা সমর্পণে তার যে আগ্রহ, সেখানে গ্রামীণ মূল্যবোধের ভূমিকাই মুখ্য। বাচ্চুর বিবাহ এবং আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে গ্রামীণ জীবনবাস্তবতারই রূপায়ণ ঘটেছে। কিন্তু বাচ্চুর এই অর্ন্তময়, স্বাবলম্ব জীবনযাত্রা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্ত্রী ছবিকে নয়ে নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পর একদিন 'সকাল বেলা ছবি তাকে ঠেলে জাগিয়ে দিল। পুলিশে ঘিরে ফেলেছে বাড়ী। মাসখানেক আগে চরের জমির সীমানা নিয়ে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে গিয়েছিল। বাচ্চুও জড়িত ছিল সেই হাঙ্গামায়। পুলিশ সেই ব্যাপারে গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে তাকে ধরতে এসেছে।'[৭৭] উপন্যাস-কাহিনীর এখানেই পরিসমাপ্তি।

"রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ" উপন্যাসে সত্যেন সেন কারাগারের অন্তরালে বসে বহির্জগতের যে অভিক্ষিপ্ত একেকটি অঙ্গকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তারই একটির সামগ্রিক বিন্যাস "একুল ভাঙ্গে ওকুল গড়ে" উপন্যাস! একটা জীবনসমগ্রতার রূপায়ণে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির নিরাসক্ত বিস্তার প্রকৃত অর্থেই তুলনারহিত। উপন্যাস যদি হয় জীবনশিল্প, এবং সেই জীবনের প্রতি ঐকান্তিকতা বশত কখনো কখনো যদি শিল্প গৌণ হয়ে পড়ে, তখন জীবনের প্রতি প্রবল পক্ষপাতিত্বের মধ্যেই আমরা চরিতার্থতার উপাদান আবিষ্কার করি। সত্যেন সেনের কাছে জীবন ও শিল্প যেন তুল্যমূল্য। একট নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনসমগ্রতার অনুপুঙ্খ শব্দচিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে, সেই জীবনের নির্মাণ ও ভাঙনশীল স্বরূপসত্যের অনুষঙ্গেই যেন তাঁর উপন্যাসে শিল্প

বিপন্ন। কিন্তু জীবনের প্রতি যে ইতিবাচক আকর্ষণ সত্যেন সেনের মীমাংসিত জীবনাদর্শবাহিত, তা স্মরণে রাখলে আলোচিত উপন্যাসের শিল্পবিচ্যুতি তেমন পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে না। কারণ, যে-সময়কালে বাংলাদেশের অধিকাংশ সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মীই শিল্পের মধ্যে পলায়নের আনন্দলোক নির্মাণ করেছিলেন, লিপ্ত ছিলেন পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের ভয়াল আক্রোশ থেকে জীবন-জীবিকাকে মুক্ত করার প্রয়াসে, সে-সময়কালেই সত্যেন সেন কেবল নিজ জীবনের জন্য নয়, সমগ্র সমাজকাঠামোর অনিবার্য রূপান্তরকে জীবনবোধের কেন্দ্রস্থিত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর উপন্যাসসমূহের মধ্য দিয়ে। এদিক থেকে তাঁর উপন্যাস বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ধারায় এক গৌরবময় সংযোজন।

তথ্যনির্দেশ

১ 'সত্যেন সেন ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে মে মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী থানার সোনারঙ গ্রামে বিশিষ্ট সেন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর এক কাকা বিখ্যাত পণ্ডিত ও ভারততত্ত্ববিদ ক্ষিতি-মোহন সেন। আরেক কাকা এ শতাব্দীর প্রথম দিকের শিশু সাহিত্যিক মনোমোহন সেন।'' (দ্রষ্টব্য : নজরুল আলম, 'মৃত্যুঞ্জয়ী সত্যেন সেন', দৈনিক সংবাদ, ৬ মার্চ ১৯৮৬, ঢাকা)

২ George steiner : Language and Silence, (1967), Quoted, Malcolm Bradbury : Possibilities, Oxford University Press, 1973, See page 169

৩ Malcolm Bradbury, Possibilities P. 170

৪ কৈশোরে 'কংগ্রেস-এর মাধ্যমে রাজনীতিসম্পৃক্তি ঘটলেও সত্যেন সেনের প্রকৃত রাজনৈতিক জীবন শুরু ১৯৩১ সালে। বিপ্লবী সংগঠন 'যুগান্তর'-এর সাথে এ-সময় যুক্ত হন তিনি। এবং ১৯৩১ সালেই প্রথম জেলে যান। ১৯৩৩ সালে মুক্তি পেলেও পুনরায় এ-বছরই গ্রেফতার হন তিনি। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কারাভোগের

পর মুক্তিলাভ করেন। ১৯৪৯ সালে শুরু হয় তাঁর পাকিস্তানের জেল জীবন। এবং পাকিস্তানের কারাগারে তাঁর জীবনের প্রায় ১৪ বছর অতিবাহিত হয়।

৫ এই বিভাজন-সীমার মধ্যে সত্যেন সেনের "ভোরের বিহঙ্গী" (প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬, প্রকাশ ভবন, ঢাকা) উপন্যাসটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তিরিশের দশকে রচিত কৈশোরক আবেগ-অনুভূতি প্রধান গ্রন্থটিতে তাঁর জীবনাদর্শ ও শিল্পচিন্তার প্রতিফলন ঘটেনি।

৬ সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ,' বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, প্র. প্র. ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২২

৭ প্র. প্র. ১৩৭৩, পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা

৮ গ্রন্থসূচনায় উপস্থাপিত সত্যেন সেনের হস্তলিপি ও স্বাক্ষরসম্বলিত স্বীকারোক্তি (তারিখ : রাজশাহী সেন্ট্রাল জেল, ১৯৫৯)।

৯ রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ, ডিসেম্বর ১৯৭১, মুক্তাধারা (স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা), পৃ. ১

১০ সৈয়দ আকরম হোসেন, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ, প্র. প্র. ১৯৮১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা পৃ. ২৫০-৫১

১১ রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ, পূর্বোক্ত পৃ. ২

১২ পূর্বোক্ত, পৃ. ২-৩

১৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

১৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

১৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

১৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২-৩৩

১৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

১৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

১৯ রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০

২০ পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫

২১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭

২২ পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

২৩ পদচিহ্ন, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৭৫, কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা

২৪ 'নিজের গ্রামের প্রতি সত্যেন দার আকর্ষণ ছিল গভীর। পদচিহ্ন উপন্যাসে তাঁর গ্রামেরই ছায়াপাত ঘটেছে। নিজের গ্রামের গল্প বলতে বলতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে দেখেছি বহুদিন। কথার পিঠে কথা জুড়ে বর্ণনার জাল বুনে চলতেন। কিভাবে বছরের প্রায় বেশীর ভাগ সময়টা ফাকা থাকতো, আবার পূজোর সময় কিভাবে তা গ্রামবাসীর আগমনে ভরে উঠতো সে কথা তাঁর মুখ থেকে বহুদিন শুনেছি।' (দ্র. অজয় রায়, 'সত্যেন সেন--এক অনন্য ব্যক্তিত্ব', গণসাহিত্য, সম্পাদক : আবুল হাসনাত, অষ্টম বর্ষ ॥ চতুর্থ-ষষ্ঠ সংখ্যা ॥ চৈত্র ১৩৮৬), পৃ. ১১

২৫ ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয়বারের মতো কারাভোগ করেন।

২৬ অজয় রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১-১২

২৭ পদচিহ্ন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১

২৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

২৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-১৮

৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৩১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৩২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

৩৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭

৩৪ পূর্বোক্ত, পৃ, ১৩১-৩২

৩৫ পূর্বোক্ত, পৃ, ১৪২

৩৬ পূর্বোক্ত, পৃ, ১৫৬

৩৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬-৩৭

৩৮ পদচিহ্ন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯

৩৯ পূর্বোক্ত পৃ. ২৭২

৪০ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩

৪১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪

৪২ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১

৪৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

৪৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

৪৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২

৪৬ সেয়ানা, প্র. প্র. আশ্বিন, ১৩৭৫, প্রকাশ ভবন, ঢাকা

৪৭ কানাই সামন্ত, 'সত্যেন সেন', গণসাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

৪৮ সন্‌জীদা খাতুন, 'সেয়ানা', গণসাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

৪৯ মনোজ বসু, নিশিকুটুম্ব, আগস্ট, ১৯৬৩, কলিকাতা

৫০ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৩৮০, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পৃ. ৬৪০

৫১ কানাই সামন্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১-৩২

৫২ সেয়ানা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

৫৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

৫৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

৫৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

৫৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯

৫৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮-৩৯

৫৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫

৫৯ পূর্বোক্ত, ১৮২-৮৩

৬০ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩

৬১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫

৬২ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১

৬৩ সেয়ানা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫

৬৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০

৬৫ এ কুল ভাঙ্গে ও কুল গড়ে, প্র. প্র. ১৯৭১, আনিছ ব্রাদার্স, ঢাকা

৬৬ পূর্বোক্ত, ভূমিকা

৬৭ পূর্বোক্ত, পরিচ্ছেদ-এক, পৃ. ৩

৬৮ পূর্বোক্ত, পরিচ্ছেদ-তিন, পৃ. ২৭

৬৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

৭০ পূর্বোক্ত, পরিচ্ছেদ বারো, পৃ. ১৪৪

৭১ পরিচ্ছেদ-পনেরো, পৃ. ১৭৪

৭২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪-৭৫

৭৩ পরিচ্ছেদ-ষোল, পৃ. ১৮৪

৭৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬

৭৫ পরিচ্ছেদ-বাইশ, পৃ. ২৪৫-৪৬

৭৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭

৭৭ পরিচ্ছেদ-ত্রিশ, পৃ. ৩২২